হিমালয়ের অন্তরালে

ডাঃ সত্যনারায়ণ

কলিকাতা - ১২
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সূচনা

হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম ও তুষার-শিখরের উপর দিয়ে এরোপ্লেনে উড়ে যাবার সময় এই বইয়ের খসড়া আমি লিখি। তুষার-রেখার উপর দিয়ে যাবার সময় তিব্বতের ঘূর্ণাবর্তের তীব্রতার মধ্যে আমি জড়িত হয়ে পড়ি।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পার্লামেণ্টে আমি তিব্বতের ও হিমালয়ের পক্ষ সমর্থন করেছিলাম এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন দলাই লামা নিরাপত্তার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সময় আমি খাম্বা গেরিলাদের দলে যোগদান করি। উত্তরমেরু হতে আন্দামান পর্যন্ত যতগুলি দুঃসাহসিক কাজ আমি এ পর্যন্ত করেছি, তার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক ও অতুলনীয়।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ দলাই লামা হিমালয়ের দিকে আসবার সময় তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কম্যুনিস্ট ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এশিয়ার নব বিপ্লবের বাণী বহির্জগতে না পৌঁছলেও, হিমালয়ের উপর যে একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা প্রমাণিত হয় এবং এই সূত্রে অনেকগুলি প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট চীনের সৈন্যরা রক্তস্নানে মত্ত হয়। লাল চীন তিব্বতীদের নিশ্চিহ্ন করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিল। অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যা সত্ত্বেও লামারা নিজের জীবন বিপন্ন করে বুদ্ধের মূর্তি নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন। আর ভাগ্যহীনা তিব্বতী মায়েরা তাদের শিশুদের চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গীন থেকে বাঁচাবার জন্যে 'বক্কু'র মধ্যে লুকিয়ে রেখে এই পথে চলেছিল। এই যাযাবর দলের সঙ্গী হয়ে ও ক্রমাগত প্রচণ্ড চীনা অগ্নিবর্ষণ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে সময় সময় আমার মনে হত যেন আমি একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। হিমালয়ের উপর তুষার-রেখা, যেখানে আমরা ছিলাম, সেই স্থানই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবার উপায় বলে দিয়েছিল।

হিমালয়ের সীমান্তের ঘটনাবলীর মধ্যে আমাদের দেশও অতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছিল। চীনারা স্থির করে তিব্বতকে পায়ের তলায় রাখতে হলে হিমালয়ের প্রাচীরের মধ্যবর্তী গিরিপথ, চারণভূমি, সীমান্তের বনভূমি ও উর্বর

জমির উপর আধিপত্য চাই। এইসব স্থানই ভারতের অন্তর্ভূত। তিব্বতকে দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধন করবার সময় ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সামরিক নীতির স্বরূপ পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

এশিয়ার ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়ে তিব্বতের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতাই আমাদের আগামী ঘটনাবলীর সঠিক হদিশ দেয়। এ কেবল ভারত, তিব্বত বা চীন নয়, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তিব্বত ও হিমালয়ের এই যুদ্ধ এখনও অসমাপ্ত। মানবিক অধিকার, আত্মসম্মান ও মানুষের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কর্মশক্তির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। তুষার-যবনিকার অন্তরালে যে ঘটনা ঘটছে, সে সম্বন্ধে এই লেখা যেন মানুষকে এক বিরাট কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে আর তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা
১৯৬০

সত্যনারায়ণ

ভোরের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা

১। দিল্লীতে আঁধি

"ওঁ মণিপদ্মে হুম্!"

"নমো তস্‌স ভগবতো···!"
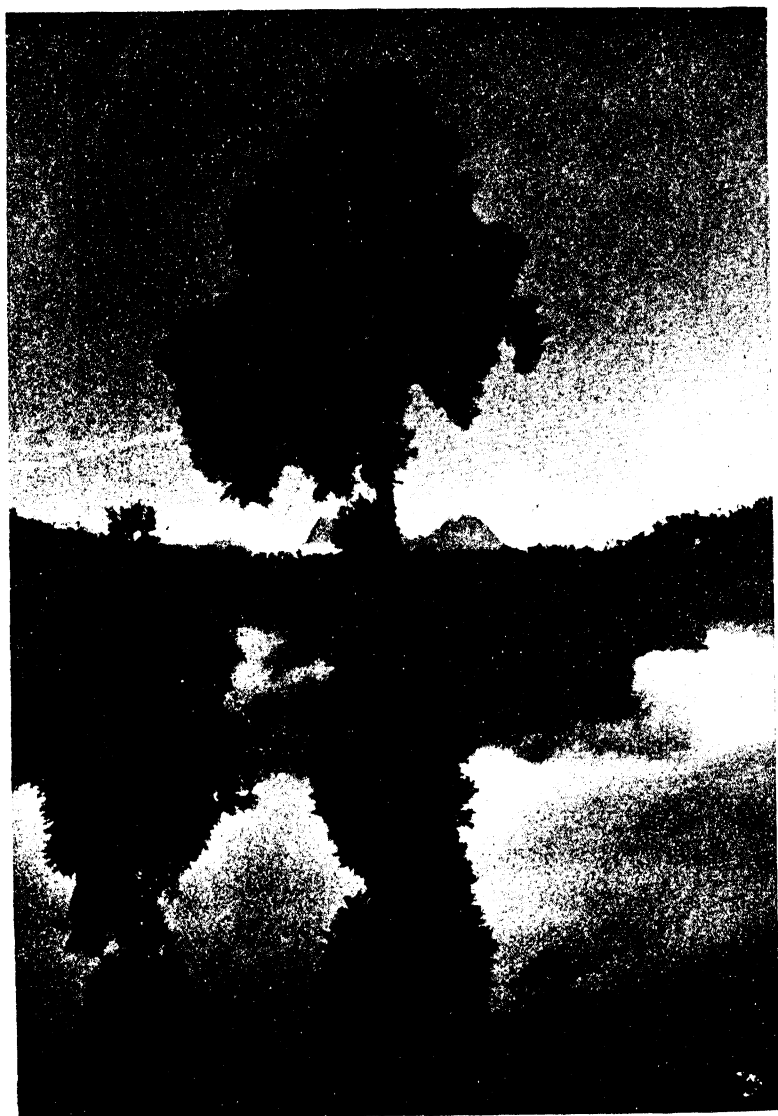
দু'জন এই মন্ত্রোচ্চারণ করছিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত। একজনের স্বর গম্ভীর, অন্যজনের কোমল। হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথে এই এই একই কণ্ঠ আমি বারবার শুনেছি।

এক ঝলক গরম হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই আমি জেগে উঠলাম। গ্রীষ্মকাল। দিল্লী মহানগরীর আকাশের তলায় ঘাসের উপর গত রাতটা আমার কেটেছে। ধুলোর ঝড় উঠেছে আকাশে। জীবন যেন মূর্ছাহত।

দূরে, কোথা থেকে ভেসে আসছে একটি করুণ সুর—বোধহয় রেডিও বাজছে। একটু পরেই শুনতে পেলাম কবিগুরুর 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।'

সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে দিল সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর—"ওঁ মণিপদ্মে হুম্।"

বাগানের বেড়ার ধারে এসে থেমে দাঁড়াল ওরা। আমাকে দেখতে পেয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে লামা তাঁর হাত তুললেন। তিব্বতের তরুণীটি প্রণাম জানাল। দু'জনেই আমার বন্ধু—তিব্বতের লামা সাংগে রিমপোচে[১] আর তাঁর শিষ্যা পেমা।

বাগানের গেট খুলতে খুলতে বললাম, "এই গ্রীষ্মে যে দিল্লীতে আপনার দেখা পাব, আমি কল্পনাও করতে পারিনি, রিমপোচে! পেমা, তুমিও দেখছি অনেক পালটে গিয়েছ।"

"আমরা এখন তিব্বতী উদ্বাস্তু। ড্রাগনের কবল থেকে আমরা

(১) রিমপোচে = রত্ন

প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। দেখে তুমি অবাক হচ্ছ না?" পেমা জবাব দিল।

শৈশব থেকেই রিমপোচেকে আমি জানি। বৌদ্ধ মঠ আর বিহারে মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওঁর ওই অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি দেখে আমার মনে হয়েছে, অলৌকিক যে-সব বিদ্যাকে উনি আয়ত্ত করেছেন, তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। লামামাত্রেই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। রিমপোচের মুখের প্রতিটি ভাব সেই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিত।

ওঁর এক প্রিয় শিষ্যের মেয়ে পেমা। ওকে আমি প্রথম দেখি বুদ্ধগয়ায়। ওর বাবা আর মা সেখানে তীর্থ করতে এসেছিলেন। তারপর স্কুলে পড়বার জন্যে পেমা ভারতবর্ষেই থেকে যায়। শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিল একবার। সেখানে রবীন্দ্রসংগীত শুনে ওর খুব ভাল লেগেছিল। পরে আমাদের মুক্তি-আন্দোলনের সময়ে আমি যখন বাইরে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখা হল তার সঙ্গে এক তিব্বতী গ্রামে, সে-ই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তখন থেকেই ও আমার মনের উপরে একটি গভীর দাগ ফেলেছে, আমাকে মুগ্ধ করেছে। মোহিত হয়েছি শুধু ওর লাবণ্য, সারল্য অথবা সৌন্দর্যে নয়, ওর প্রাণপ্রাচুর্যেও। বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে আমার কল্পনায় যেন ও হয়ে উঠেছে অনিন্দ্যসুন্দর।

ড্রইংরুমে, ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তির সামনে আমরা বসলাম। পেমার পরনে একটি হলদে রঙের তিব্বতী বাকু[১] আর কমলা-রঙের জামা। ঘামে ভেজা তার মুখ; দেহ ধূলিধূসর।

লামার দেখাদেখি পেমাও এসে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে বুদ্ধকে প্রণাম জানাল। ক্লান্ত কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হতে লাগল "ওঁ মণিপদ্মে হুম্!"

(১) বাকু = তিব্বতী পোশাক

"প্রভু বুদ্ধই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন," লামা বললেন, "তিনিই আদেশ দিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী চীনাদের তিব্বত থেকে হটিয়ে দেবার কাজে আমাদের সাহায্য করবে তোমরা।"

লামা তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। জানি না কি ভাবছিলেন। হয়তো তিব্বতের কথাই জেগেছিল তাঁর মনে। কিছুক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, "১৯৫০ সালে আমি তখন দলাই লামার পোতালা-প্রাসাদে। রাষ্ট্র-জ্যোতিষী বলেছিলেন, "চীনারা এ-দেশ অধিকার করবে। শুধু তাই নয়, যে ভূমিতে প্রভু বুদ্ধের জন্ম, যেখানে তিনি বোধি অর্জন করেছিলেন এবং মানবতার পরামুক্তির জন্য তাঁর ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই পবিত্র ভূমিতেও তারা আক্রমণ চালাবে। মানুষ অনাহারে মরবে। ব্যাপকভাবে গুলিগোলা চলবে। আর চীনারা তারই নাম দেবে 'মুক্তি-অভিযান'। তারা আমাদের পবিত্র মঠগুলিকে ধ্বংস করবে, লামাদের হত্যা করবে; আমাদের ভারতীয় ভাইদেরও তারা নির্যাতন করবে এবং আমাদের অসংখ্য ভারতীয় ভাই তাদের গুলিতে প্রাণ হারাবে। এমনকি, দলাই লামাও তিব্বত ত্যাগ করবেন। গোপনে তিব্বত ত্যাগ করে তিনি প্রভু বুদ্ধের দেশে গিয়ে আশ্রয় নেবেন।"

পেমা জিজ্ঞেস করল, "প্রভু বুদ্ধ কি আমাদের করুণা করবেন না?"

"করবেন। তিনিই শেষে আমাদের পরিত্রাণ করবেন। দলাই লামা সাত সমুদ্রের ওপার থেকে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই সাহায্য ও সমর্থন পাবেন এবং চীনা আক্রমণকারীরাও আমাদের দেশ থেকে পিকিংয়ে ফিরে যাবে। সেখানে তাদের আপন কর্তারাই তাদের শিরশ্ছেদ করবে। তিব্বতের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্বেও—পর্বতমালা আর সপ্তসিন্ধু আর চন্দ্র-সূর্যের ওপারেও—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সমগ্র তিব্বতই বিশ্বাস করে যে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নয়।"

আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, "এই ব্যাপারেই আমরা তোমাদের সাহায্য চাই।"

"কী সাহায্য আশা করেন আপনারা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"১৯৫০-এর অক্টোবর মাসে চীনারা যখন তিব্বতকে আক্রমণ করে তখন যে সাহায্য চেয়েছিলাম সেই একই সাহায্য। সামরিক সাহায্য আমরা চাইনি।"

লামা তাঁর তিব্বতী পোশাকের ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে বললেন, "এই আমার সম্বল। ১৯৫০ সালের ৩১শে অক্টোবর চীনের কাছে ভারত যে তার দ্বিতীয় লিপি পাঠিয়েছিল, তা আমি সংগ্রহ করেছি। ভারত সরকার তাতে স্পষ্টভাবেই বলছেন, 'তিব্বতের বিরুদ্ধে চীনা সরকারের সামরিক ব্যবস্থায় যে পৃথিবীতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ-ব্যবস্থা যে একটা সামগ্রিক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই...'। এখন এই মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতেই তোমাদের পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।"

লামার কথায় বাধা পড়ল। চেয়ে দেখি, খবরের কাগজ আর কিছু সংসদীয় কাগজপত্র এসেছে। সেদিন ১৯৫৪ সনের ১৫ই মে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডলাইনে বলা হয়েছে যে, তিব্বত সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পন্ন হবে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নেই। সংসদে সেদিন এ-সম্পর্কে বিতর্ক হবার কথা।

লামা বললেন, "আমাদের দেশ, জাতি আর সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। ভারতীয় সংসদের তুমি সদস্য। বিশ্ব-ইতিহাসের এই সংকটকালে তোমার দেশ যাতে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেদিকে তোমাকে লক্ষ্য রাখতেই হবে।"

"ভারত-চীন চুক্তির উপরে কি এতই গুরুত্ব আরোপ করেন আপনি?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"১৯৫০এ যা ঘটেছে তাতে বলতে পারি, শুধু তিব্বত কেন—ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই এ এক অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অস্ত্রবল এবং ছল-চাতুরির সাহায্যে চীন যেভাবে তিব্বতকে দখল করেছে, এশীয় অগ্রগতির পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকারক। শুধু তাই নয়, উত্তর-সীমান্তে ভারতের নিরাপত্তাও এর ফলে একটা ভয়ংকর আঘাত পাবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর পোশাকের মধ্য থেকে একটা মানচিত্র বার করলেন। তারপর মেঝের উপরে সেই মানচিত্রটাকে বিছিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "দ্যাখো, চীনাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য যে কী, এই মানচিত্র থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে পারা যাবে ভারত-জয়ই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। চীনারা তিব্বতকে জবরদখল করেছে। আর ভারত তা মেনে নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই চীনারা বলছে যে, আসামের যে-অংশ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের যে-অংশ তিস্তার উত্তরে পড়ে, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভুটান, সিকিম আর নেপাল—এককথায় লাদক পর্যন্ত বিস্তৃত যে উত্তরাঞ্চল তোমাদের দেশমাতৃকার মাথার মুকুট তা এখন তাদের মুঠোর মধ্যে। হিমালয় এতকাল যে নিরাপত্তা দিয়েছে তোমাদের, সেই সামগ্রিক নিরাপত্তাকে কেড়ে নিয়ে হিমালয় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েই প্রভু বুদ্ধের এই পবিত্র ভূমিকে তারা বিপর্যস্ত করতে পারে। আক্রমণকারীকে যদি একবার তোষণ করো, তোমাকে উদরস্থ না করে সে ক্ষান্ত হবে না—ইতিহাসই তার প্রমাণ দিচ্ছে।"

"চীনাদের কি তোষণ করেছি আমরা?"—প্রশ্ন করলাম।

"ইতিহাসকে তোমরা অস্বীকার করতে পার না। ১৯৫০-এর ১৩ই নবেম্বর তারিখে লাসায় ভারতীয় মিশনের প্রধান প্রতিনিধি তাঁর সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, চীনা কমিউনিস্ট সৈন্যরা তখনও চামদো এলাকায় রয়েছে; লাসা থেকে তাদের দূরত্ব কোনক্রমেই

৩০০ মাইলের কম হবে না। ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে তখন এ-কথাও বলা হয়েছিল যে তিব্বতের সৈন্যসংখ্যা যদিও ১০ হাজারের বেশি নয়, তাদের অস্ত্রবল যদিও সামান্য, এবং চীনা কমিউনিস্ট বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যদিও তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, তবুও সমুদ্রতল থেকে ১২ হাজার ফুট উঁচু তিব্বতের রুক্ষ মালভূমিই আক্রমণকারীর সম্মুখে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বলা হয়েছিল যে, শীত পড়বার পর তিব্বতের অনেকাংশই তুষারে ঢাকা পড়বে, এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে পৃথিবীর দুটি সর্বোচ্চ গিরিপথ—সারগুং লা (১৬,৭০০ ফুট) এবং ত্রো লা (১৭,১০০ ফুট)—অতিক্রম করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তোমাদের সরকারই চীনা আক্রমণকারীদের সেই অসুবিধার অবসান ঘটিয়েছিলেন।"

"কী করে ?"

"সেই কথাই বলছি। বিমান এবং জলপথে চীনারা তাদের অধিনায়ক এবং যন্ত্রবিদ্‌দের তখন কলকাতায় নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে ছিল প্রচুর সরঞ্জাম আর রসদ। সেখান থেকে কালিম্পং আর গ্যাংটকের পথে তিব্বতে ঢুকবার সমস্ত সুবিধেই তাদের দেওয়া হয়। তার ফলে চামদো ফ্রন্টের খাম্বা যোদ্ধাদের যেন পিছন থেকে ছুরি মারা হল। তিব্বতী স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপরেও এর ফল হয়েছে মারাত্মক। খামের সমগ্র জনসাধারণই সেদিন গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ লাভ তাতে হয়নি। চীনারা তাদের খাদ্য কেড়ে নিল, পুরুষদের হত্যা করল এবং নারীদের সব ক্রীতদাসী অথবা রক্ষিতা হিসাবে ধরে নিয়ে গেল। এই পেমাকেও সেদিন কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। তোমাদের সীমান্ত-অঞ্চল থেকেই এমন বহু পেমার খবর আজ পাওয়া যাবে।"

তাঁর কথা শুনে নিজেকে বড়ই অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। পেমার দিকে তাকালাম। তার মুখের উপরে যেন সেই যন্ত্রণা আর

নির্যাতনেরই চিহ্ন আঁকা রয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আমি প্রশ্ন করলাম, "এখন তাহলে আমাদের কর্তব্য কী ?"

"তিব্বতীদের উপরে যে নির্যাতন চলেছে, সেই নির্যাতনের হাত থেকে তোমাদের আপন সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।"

"তা কি আমরা করছি না ?"

"গ্যাংটক এবং কালিম্পং হয়ে আমি এখানে এসেছি। প্রকাশ্যে শুধু যানবাহনের তদারক করাই যাদের কাজ, সেই চীনা বিশেষজ্ঞরা সেখানে তলে-তলে তাদের অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য ব্যাপকভাবে মানচিত্র তৈরী করে চলেছে। বিভীষণ-বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারেও তাদের আয়োজনের ত্রুটি নেই। তোমাদের স্বার্থ এতে বিপন্ন হবে।"

"কথাটা আমি মনে রাখব।" উঠে পড়ে আমি বললাম, "এখন আমাকে সংসদে যেতে হবে। ভারত-চীন চুক্তি সম্পর্কে সেখানে বিতর্ক হবার কথা।"

"যোগাযোগটা অদ্ভুত নয় ? প্রভু বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বোধি লাভ করেছিলেন ; তাঁর নির্বাণও হয়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমাতেই। আর সেই বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্কালেই তোমরা এক বৌদ্ধ দেশের ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছ। তিব্বতীরা যাতে প্রাণে বাঁচে, তাদের সংস্কৃতি যাতে রক্ষা পায়, এই শুভ মুহূর্তেও কি তা তোমরা ভাববে না ?"

"কী করা এখন সংগত ?"

"চীনারা দাবি করছে যে তিব্বত চীনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তিব্বতের সমস্যা হচ্ছে চীনের ঘরোয়া সমস্যা। ভারতের পক্ষে এই দাবিকে মেনে নেওয়া কিছুতেই সংগত হবে না। ঐতিহাসিক দলিলপত্রই এই দাবি মিথ্যা প্রমাণ করবে। তিব্বত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এ-দাবি একমাত্র আক্রমণকারী, কমিউনিস্ট আর নির্বোধ ছাড়া

অন্য কারও পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিব্বত যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, এ-কথার সপক্ষে অকাট্য সব প্রমাণ রয়েছে।”

তাঁর উক্তির সমর্থনে লামা তাঁর পোশাকের মধ্য থেকে আবার একটি দলিল বার করলেন এবং স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে লাগলেন, “১৯১২ সাল শেষ হবার আগেই শেষ চীনা সৈন্যটিকেও তিব্বত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯১৩-র ১১ই জানুয়ারী তারিখে বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে দলাই লামা তাঁর দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তার সূচনায় বলা আছে, ‘যেহেতু মঙ্গোলিয়া ও তিব্বত মাঞ্চু-বংশের অধীনতা থেকে মুক্ত ও চীন থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে…’। চীন এবং তিব্বত প্রায় একই সময়ে বিদেশী মাঞ্চু-বংশের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়।”

লামার যুক্তি খুবই জোরালো। সেই কথা চিন্তা করতে করতেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। লামাও বেরিয়ে এলেন আমার সঙ্গে। পেমা এল না। সে পরিশ্রান্ত। তাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

সংসদের অধিবেশন তখন সকাল আটটায় শুরু হত। তিব্বত সংক্রান্ত বিতর্কে লামার আগ্রহ দেখে আমি তাঁকে কথা দিলাম যে, তাঁর জন্য আমি ভিজিটার্স গ্যালারির একটা কার্ড সংগ্রহ করে দেব।

লিটন রোড ধরে যেতে যেতে দেখলাম চীনা দূতাবাসের দরজার সামনে একটা ছোট্ট মিছিল তৈরির চেষ্টা চলেছে। মিছিলের মানুষদের হাতে লাল পতাকা। সামনে এগোতে এগোতে তারা স্লোগান হাঁকছে :

“হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই।”

“ভারতের মাটিতে সামরিক ঘাটি করা—চলবে না, চলবে না।”

"চীনবিরোধী বিদেশী প্রভাব থেকে ভারতকে—মুক্ত করো, মুক্ত করো!"

মিছিলে যারা যোগ দিয়েছে, তাদের কয়েকজনকে আমি চিনি। প্রায়ই তাদের আমি সংসদ-ভবনের পাশ দিয়ে মিছিল করে যেতে দেখেছি। তাদেরই একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যে-সব স্লোগান দিচ্ছ, তার অর্থ তুমি জান ?"

"অর্থ জেনে আমাদের লাভ কী ? আমাদের টাকা পেলেই হল।"

"কারা টাকা দেয় ?"

"চীনারা।"

"কত টাকা দেয় ?"

"এক বেলা স্লোগান হাঁকা, মিছিল করা আর বিক্ষোভ জানানোর জন্যে তারা মাথাপিছু দু' টাকা দেয়।"

"আর কিছু দেয় ?"

"দেয়। টাকা ছাড়াও আমাদের চা-বিস্কুট খেতে দেয়।"

"এই যথেষ্ট ?"

"কী জানেন, চীনারা যে মোট টাকাটা দেয়, তার অঙ্কটা নেহাত কম নয়। তবে চীনাদের এজেণ্ট হিসেবে যে পার্টি আমাদের যোগাড় করে, সেই পার্টি আবার এই টাকাটা থেকে বেশ মোটা রকমের একটা কমিশন কেটে রাখে।"

কথা বলতে বলতে আমরা রাস্তার মোড়ে চলে এসেছি। সেখান থেকে একটা শর্টকাট ধরে সংসদ-ভবনের দিকে এগিয়ে চললাম।

সংসদের আলোচনায় তিব্বত-সমস্যা অথবা সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের হিমালয়-সীমান্ত সমস্যার যে গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল তা তারা পায়নি। আলোচনাটা যদি তিব্বত সম্পর্কে না হয়ে মঙ্গলগ্রহ অথবা বৃহস্পতি-গ্রহ সম্পর্কে হত, তাহলেও হয়ত এর চাইতে কিছু কম সময় দেওয়া হত না।

সময় তো দেওয়া হলই না, তার উপরে আবার তিব্বত সম্পর্কে ভারত-চীন চুক্তির প্রস্তাবনায় পঞ্চশীলের নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এই মহৎ নীতি থেকে বিচ্যুত হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আমাদের ক্ষেত্রে ছিল না। কিন্তু চীন অথবা তার কমিউনিস্ট দালালদের কাছে এইটাই ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের অশুভ উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার ধূম্রাবরণের মত দেখা দিল। পঞ্চশীল নীতির প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার একটা ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা তিব্বতে তাদের সামরিক ঘাটিগুলিকে সংহত করে নেবার সময় পেল। সেই সঙ্গে আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে কিছুমাত্র অসাধু উদ্দেশ্য যে তাদের নেই আমাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হল। চীনারা অনুমান করেছিল যে পঞ্চশীল আমাদের চিত্তে খানিকটা আফিঙের কাজ করবে এবং তার ফলে আমাদের আপন স্বার্থ সম্পর্কে কোনও হুঁশই আমাদের থাকবে না।

পেমার মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখেই চীনাদের নৃশংসতা সম্পর্কে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। তিব্বতে তারা যে অত্যাচার চালিয়েছে, তারই স্মারক যেন ওই ক্ষতচিহ্ন। মনের শান্তি হারালাম। স্থির করলাম, আমার যখন বক্তৃতার পালা আসবে, তিব্বতকে সমর্থন করেই আমি বক্তৃতা দেব।

কিন্তু তিব্বতের কথা আমি যাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম তাঁদের কানে তা যেন বেসুরো ঠেকল।

সাংগে রিমপোচের সেদিন অস্থিরতার সীমা ছিল না। তিনি বললেন, "চীনারা যা আশা করেছিল ভারত তাদের তার চাইতেও বেশি সুবিধা করে দিল।"

"কিন্তু ভারত আর চীনের মধ্যে এই চুক্তির ফলে কি এশিয়ার দুই বৃহত্তম দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়ে উঠল না?"

"না।" লামা বললেন, "তিব্বত সম্পর্কে এই চুক্তির ফলেই যে চীন-ভারত সংঘর্ষের আশঙ্কা দূরীভূত হল তা নয়। বরং এরই ফলে চীনের ক্ষুধা আরও বৃদ্ধি পেল। ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধঘোষণা ছাড়া এ আর কিছু নয়।"

সংসদ-ভবনের বাইরে তখন দারুণ উত্তাপ। কিন্তু কী জানি কেন, সে-উত্তাপ আমাদের স্পর্শও করেনি। সংসদের বাইরে এসে ধীরে ধীরে আমরা সর্বগ্রাসী সেই আঁধির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম।

২। খামের সেই মেয়েটি

গুনগুন করে পেমা গাইছিল একটি রবীন্দ্রসংগীত—

নূতন করিয়া লহো আরবার
চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিতে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।

দিনটা ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। এ এক মহাতিথি। এই পূর্ণিমার দিনেই বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, এবং এই নশ্বর পৃথিবী থেকে তাঁর অন্তর্ধান—বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ।

সকাল থেকে সাংগে রিমপোচে তিব্বতী শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদাত্ত গলায় আবৃত্তি করে চলেছেন স্তোত্র। মাঝে-মাঝে তিনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, কি-যেন গোপন মন্ত্র চাপা গলায় আওড়াচ্ছিলেন, এবং বুদ্ধের মূর্তির সামনে তিব্বতী প্রথায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছিলেন। এই কঠিন শারীরিক পরিশ্রম তিনি অক্লেশে অজস্রবার করলেন।

পেমা তার তিব্বতী পোশাক খুলে ফেলেছে, সেজেছে বাঙালী মেয়েদের মত—পরনে তার একটা নতুন জাফরানী শাড়ি। চকচকে

একটা পিতলের রেকাবির উপর কর্পূরের সঙ্গে কয়েকটা প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে বুদ্ধের মূর্তির সম্মুখে সেটা আলগোছে ঘোরাচ্ছে—বুদ্ধের আরতি করছে। যে বেদীর উপর মূর্তিটা বসানো আছে, তার চার ধারেও কয়েকটা প্রদীপ জ্বালা হয়েছে।

আরতি-দীপের আলোতে পেমার গৌরবর্ণটি ও শান্ত মুখশ্রী আরো উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। অন্যমনস্ক এক মুহূর্তে তার কাঁধ থেকে খসে পড়েছে শাড়ির প্রান্ত। মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন দেখতে পেলাম আমার কল্পনায় আঁকা তার রূপটি—তার মুখের সেই অপরূপ মাধুর্যে এবং সরল সহজ লাবণ্যে মণ্ডিতা হয়ে সে যেন তার অকৃত্রিম রূপে ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে।

আরতি সমাপ্ত হল। শাড়ি ঠিক করে নিয়ে সে স্নিগ্ধ হেসে বলল, "শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আজ এই প্রথম শাড়ি পরলাম।"

বললাম, "রবীন্দ্রনাথের মানস-কন্যা শ্রীমতীর কথাই আজ মনে পড়ে গেল তোমার এই শাড়ি-পরা-রূপটি দেখে।"

পেমা বলল, "তোমার বুঝি মনে নেই ? যখন গুরুদেবের নৃত্যনাট্য "নটীর পূজা" অভিনীত হত, আমার রং ফর্সা বলে আমাকে ওঁরা শ্রীমতীর ভূমিকায় অভিনয় করতে নামাতেন। আচ্ছা, ওই নাটকে শ্রীমতীর জীবনে যে ভয়ংকর ঘটনার উল্লেখ আছে, সত্যিই কি তার জীবনে ওইরকম ঘটেছিল ?"

বললাম, "কিছুই অসম্ভব নয়।"

পেমা কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবল, তারপর বলল, "ভগবান বুদ্ধের আরতি করার জন্যে কি নির্দয় আর নিষ্ঠুরভাবে তারা শ্রীমতীকে হত্যা করল। এই কথা মনে হলেই আমার মনে হয় চীনাদের নিষ্ঠুরতার কথা—তিব্বতের বৌদ্ধ মঠে তাদের অত্যাচারের কথা। উঃ, সে কি বীভৎস ঘটনা! তোমার কাছে তার বর্ণনা আমি করতে পারব না। আমার ইচ্ছে করে আমি ওই শ্রীমতীর মতই যেন হতে পারি।"

"তুমি কি যেন গান করলে একটু আগে ?

"ও গান নয়, জীবনদেবতার উদ্দেশে আত্মনিবেদনের প্রার্থনা।"

বাটিতে চা ঢালতে ঢালতে পেমা চাপা গলায় আমাকে বলল, "লামারা খুব ভালো ভাগ্যগণনা করতে পারে। আমাদের ভাগ্যের কথা তাদের কাছ থেকে জেনে নিলে কেমন হয় ?"

সাংগে রিমপোচে কাছেই ছিলেন, তাঁর কানেও কথাটা পৌঁছাল। তিনি একটু হেসে বললেন, "ভাগ্য জানারই যদি ইচ্ছে তাহলে প্রকৃতির সম্মুখে গিয়ে একবার দাঁড়াও, তার পরে আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব—কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে লুকান। আজ একটা শুভদিন, চলো-না একবার বাইরে বেরই, ভাগ্যটাও পরীক্ষা করান যাক।"

সাংগে রিমপোচের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা বেরিয়ে পড়লাম। একটা চওড়া রাস্তা ধরে আমরা চললাম---পথটার নাম রাজপথ। এই রাস্তার কিনার ঘেঁষে একটা অগভীর দীঘি। ওই দীঘির জল আমাদের চোখে পড়ামাত্র আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখে পড়ল একটা আশ্চর্য দৃশ্য। জলের ধারে একটা পঙ্গু পাখি সাবধানে পাখা ঝাপটাচ্ছে। তার গায়ের কাছেই একটা গাছের ডাল নুয়ে পড়ে যেন এই অসহায় জীবটিকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা করছে আর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু বাতাসের একটা ছাট আসা মাত্র দু'জনেই যেন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু হঠাৎ এল একটা দমকা হাওয়া, টাল সামলাতে না পেরে পাখিটা পড়ে গেল।

কিন্তু ভাগ্য ভালো। বাঁধা ঘাটের ইটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ছিল একগুচ্ছ কচি ঘাস, সেই মোলায়েম ঘাসের উপর গিয়ে পড়ল পাখিটা। ওই সবুজ দূর্বাদল অনেক নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হল তার।

লামা সাংগে রিমপোচে লক্ষ্য করছিলেন এই ঘটনা, অবশেষে তিনি

বললেন, "নয়াদিল্লীর নির্লিপ্ত হৃদয়হীনতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে এই দৃশ্য। স্নেহ ও মমত্বের কোমল আশ্রয় ওই অসহায়েরাও পেল—কিন্তু—"

লামা তাঁর বক্তব্য আর পরিষ্কার করলেন না।

অল্পদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের তিব্বতী বন্ধুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেউই তাঁদের আশ্রয় দিতে চান না, এমনকি তাঁদের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনতেও নারাজ। তাঁরা তিব্বতের সেই সুদূর খাম প্রদেশ থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষকে কেবল সতর্ক করে দেবার জন্য ; জানাবার জন্য—ভারতবর্ষ যেন চীনাদের বিশ্বাস না করে।

লামা যে-সব নকশা ও ম্যাপ সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে তিব্বতের চীনা সমরকর্তাদের আঁকা। ওইসব দলিলপত্র থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছিল, অভিযাত্রী চীনা সেনাদলের উপর এইরূপ নির্দেশই আছে যে, তারা তিব্বতের সীমান্তে না থেমে যেন হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। আর, প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের সেই সুউচ্চ মালভূমিতে এসে থামাও তাদের পক্ষে সম্ভব না। প্রথমত, সেখানকার অধিবাসীরা চীনাদের আপদ বলে মনে করে, অতএব সেখানে নিরাপদে থাকা কঠিন। চীনা সেনাদের দরকার হচ্ছে—তাদের উপযোগী আবহাওয়া ; আর সৈন্য-সামন্তকে অটুট ও অটল রাখার জন্য চাই বনভূমি, চারণক্ষেত্র, আর চাই উপযুক্ত খাদ্য। এর কোনোটাই হিমালয়ের ওপারে পাওয়া যায় না, এইজন্যেই ভারতভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা তাদের ভাবতে ও সেইমত ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ওইসব দলিলপত্র ভারতবর্ষে নিয়ে আসার জন্যে লামাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি এই বিপদকে তুচ্ছ করেও এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন,

তার একমাত্র কারণ বুদ্ধের এই পবিত্রভূমির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁর আশা ছিল, তিব্বতে চীনারা কি রকম অনাচার করেছে সে-কথা ভারতের নেতৃবর্গকে বুঝিয়ে বললে তাঁরা চীনাদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক হবেন। যে পথ দিয়ে চীনারা এগিয়ে যায় তার দু'পাশে কি রকম অমানুষিক অত্যাচার তারা করতে পারে, তার প্রমাণ দাখিল করার জন্যে পেমাও এসেছিল তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু আমার তিব্বতী বন্ধুদের আমি যে-সব দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই, তাঁরা কেউই এঁদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তিব্বতকে চীনের একটা প্রদেশ বলে স্বীকার করার মধ্যে যে একটা ভয়ংকর বিপদ লুকিয়ে আছে, এই পরম সত্যটিও তাঁরা বুঝতে না পেরে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিব্বতে সত্যিসত্যি কি-সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা স্পষ্টভাবে জানার চেষ্টাও করলেন না কেউ। অত্যাচার-নিপীড়িত তিব্বতীরা যখন নির্যাতনের ভয়াবহ বিবরণ দিতে লাগলেন তখনও বিষয়টার প্রতি কেউ মনোযোগ দিলেন না। প্রায় বিনা পয়সায় চিত্রসংবলিত যে-সব জবর খবর চীনারা সারা ভারতময় ছড়ায়, তারই মধ্য দিয়ে যেন তিব্বতের ছবি দেখার জন্যে সকলে ব্যস্ত রইলেন। ওই চিত্রসংবলিত বিবরণ—চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকারের পর থেকে সমস্ত তিব্বতী যেন দুধে-ভাতে আছে—এইরকম ধারণারই সৃষ্টি করেছিল।

লামা সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, "একে বলে চৌ-মন্তর। ভারতবর্ষ তখন মিস্টার চৌ-এর যাদুমন্ত্রে অভিভূত।"

চীনারা পঞ্চশীল গ্রহণ করেছে। তাই মানবিকতার যুক্তিতে তিব্বতীদের প্রতি যাঁরা সহানুভূতি জানিয়েছেন, তাঁরাও চীনাদের দোষত্রুটি দেখতে পাননি। ভারতীয় রাজনীতির এই অলস কল্পনা-বিলাস দেখে তিব্বতীরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সাংগে রিমপোচে "পঞ্চশীল" কথাটা একটু যেন ধিক্কারের সঙ্গে

উচ্চারণ করলেন, তারপর বললেন, "চীনারা প্রথমে এসে তিব্বত আক্রমণ করল, সেখানে সব লুঠ করল। তারপর তারা শিশুদের ও নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করল কেবল নিজেদের একটা তামাশার জন্যে ; পুরুষদের কাছ থেকে সবকিছু তারা কেড়ে নিল, এই কাজে যে বিন্দুমাত্র বাধা দিল তাকে হত্যা করা হল। এই সব কাজ সমাধা করে, হাত ধুয়ে এসে, তারা সই করল সেই পঞ্চশীলের চুক্তিতে, যে পঞ্চশীলের প্রধান কথা হচ্ছে—কাউকে হত্যা করব না, কাউকে লুণ্ঠন করব না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর লামা বললেন, "তিব্বতে চীনা আক্রমণের আগে তিব্বতের সঙ্গে এই চুক্তিতে সই করা উচিত ছিল ভারতবর্ষ ও চীনের।"

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর লামা নিভৃতে বসে চিন্তা করার জন্যে চলে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝের উপর পেমা এলিয়ে দিল তার শরীর, তার দুই হাত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ও একত্রিত। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে তার লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। পেমা এখন তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী তৈরি করার চেষ্টায় রত। অসংলগ্ন-ভাবে সে যেন বলতে লাগল তারই কথা।

ভারতবর্ষে তার শিক্ষা সমাপ্ত করে সে তার জন্মভূমি পূর্ব-তিব্বতের খাম প্রদেশের প্রধান শহর চামদোতে ফিরে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের আদর্শে একটা স্কুল খোলা সে স্থির করেছিল, তাদের পারিবারিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল। তার মা-বাবা তাঁদের মেয়ের এই পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। এই স্কুলের জন্যে একটা বাড়ি তৈরি প্রায় শুরু হয়েছে, এমন সময় কমিউনিস্ট সেনার প্রথম দল এসে হানা দিল তিব্বত-সীমান্তে। খামের প্রধানদের মন্ত্রণাসভার উপর পেমার বাবার কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। এর ফলে ওই সভা সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক

করলেন, চীনা হামলা রুখতেই হবে। এজন্যে লাসায় তাঁরা বার্তা পাঠালেন, এবং ভারতবর্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন দূত। কিন্তু লাসা লড়াই করতে রাজি হল না, আর ভারতীয় চেকপোস্ট কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে দিল না।

একে একে খামের প্রতিরোধ-ক্ষমতা ভেঙে পড়তে লাগল, চীনাদের প্রবল চাপ তারা রুখতে পারল না। ব্যাপার গুরুতর দেখে সুস্থ ও সবল খাম্বারা বেপরোয়া হয়ে উঠল, যুদ্ধে রত হল, এবং সুযোগমত পিছিয়ে গিয়ে চীনাদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। পরিবারের নারীদের তারা রেখে গেল বৃদ্ধ লামাদের তত্ত্বাবধানে। তাদের ধারণা ছিল যে চীনা যোদ্ধারা বীরের মতই আচরণ করবে, নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষদের উপর তারা কোনো দুর্ব্যবহার কববে না।

কিন্তু সব আশা মিথ্যা হল। চীনা সৈন্যেরা চামদোতে ঢুকেই স্বরূপ প্রকাশ করল। নৈতিক ও মানবিক কোনো নীতির ধার তারা ধারল না। তারা প্রথমে ধরে নিয়ে গেল জোয়ান বয়সের মেয়েদের ; আর, সাধারণ স্তরের কুড়ি থেকে ত্রিশজন সেনা-পিছু নিয়ে গেল একজন করে নারী।

এই কথা বলতে গিয়ে যেন শিউরে উঠল পেমা, বলল, "তার আগে আমি জানতাম না বীভৎসতা কাকে বলে, কাকে বলে পাশবিকতা।" একটু দম নিয়ে সে বলতে লাগল, "ঠিক তার পরদিন থেকে আমার রক্তবমি আরম্ভ হল, এবং যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর সাক্ষাৎ পাব বলে আশা করতে লাগলাম। চীনা বুলেটের মুখ থেকে ত্রাণ পেয়েছে এমন পুরুষরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসে গাঁয়ে ও শহরে চীনাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী বলে চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করল। খাম্বা পুরুষরা কেমন দীর্ঘ গঠনের এবং চীনারা কেমন ক্ষুদ্রাকৃতি তা তুমি জান। লাসায় পৌঁছবার জন্যে চীনা সমরনেতাদের ব্যস্ততা ছিল বলে তারা খাম প্রদেশটি পার হবার জন্যে তাড়াহুড়া করছিল। এইজন্যে

খাম্বাদের সঙ্গে চীনারা শান্তিস্থাপন করল। তার ফলে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে একত্র হতে পারলাম, আর খাম প্রদেশটি চীনাদের পক্ষে একটা দুর্লঙ্ঘ্য জায়গা হয়ে রইল। এখানে আমাদের পুরুষরা একত্র হয়ে সম্ভাব্য লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে লাগল।"

পেমা বলতে লাগল, "ইতিমধ্যে দেশে রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে এক তিব্বতী প্রতিনিধি দল গেলেন পিকিঙে। কিন্তু কোনো কথাবার্তাই সেখানে হল না। চীনারা এক বাণ্ডিল কাগজ ও বাঁশের তুলি নিয়ে এসে একটা সতের দফাওয়ালা চুক্তি খাড়া করল, তার নাম দেওয়া হল—তিব্বতের সঙ্গে মৈত্রী। কিন্তু এই শর্তে দলাই লামা ও তাঁর গবর্নমেণ্ট সম্মত হলেন না এবং তাতে সই করলেন না। কিন্তু চীনারা সব পারে—তারা দলাই লামার একটা নকল সীল তৈরি করে সেই 'সন্ধি'-চুক্তিতে তার ছাপ এঁকে দিল।"

পেমার চোখের দৃষ্টি যেন নৈরাশ্যে ও বিতৃষ্ণায় ভরা। সে বলল, "চীনাদের এই জালিয়াতি ধরতে না পেরে এই জাল চুক্তিপত্রের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষ তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করে নিল। এবং তার পরে ওই পঞ্চশীল।"

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন লামা সাংগে রিমপোচে। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, "ভারতবর্ষের সরকারী নীতি হচ্ছে—'সত্যমেব জয়তে'। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে তিব্বতের ব্যাপারে সত্যটি সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান করা হল না কেন।"

পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ধারায় বালিপাথরে তৈরি পাটলবর্ণের বুদ্ধমন্দিরগুলি শীতল হয়ে এল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন উপাসনা-অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চারদিক পবিত্র শুদ্ধ ও উৎসবময়।

মন্দির বহুলোকে পূর্ণ। হিমালয় অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগর

পর্যন্ত সব জায়গার অধিবাসী ছিল মন্দিরের ভিতর। ডান দিকে উজ্জ্বল রঙের বাকু-পরা মেয়েরা, কারো কারো পরনে শাড়ি, কারো বা বর্মী পোশাক। ধনী-দরিদ্র সকলেই একসঙ্গে মাথা নত করে প্রণামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য দেখে মনে হল—মানুষ কখনও কোনো কদর্য বা হীন কাজ করতে পারে না।

তামার থালার উপর জ্বলন্ত কর্পূর নিয়ে পুরোহিত চারদিক ঘুরতে লাগলেন। তিনি যখন পেমার কাছে এসে পৌঁছলেন, দেখলাম, জলপাইয়ের মত পেমার চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। একটু আগে দেখেছি ওই চোখ বিষাদ-মাখা।

বর্মী পুরোহিতটি তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমার শান্তি চিরস্থায়ী হোক।"

বেদীর কাছে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যে পেমাকে তিনি অনুমতি দিলেন। অদূরে তথাগত বুদ্ধের মূর্তি সকলকে অভয়বাণী দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সেই মূর্তির পা থেকে একটি সাদা ফুলের কুঁড়ি তুলে এনে একজন সিংহলী পুরোহিত পেমার হাতে সেটা দিয়ে তাকে যেন বিশেষভাবে শুভাশিস জানালেন।

জনতা ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল, তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—"নমো বুদ্ধায়"। তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়েও ওই পবিত্র ধ্বনিটি করল—"নমো বুদ্ধায়"।

সিঁড়ির উপর কয়েকজন ভিখারী আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। পেমা আমার কাছে কিছু খুচরো পয়সা চাইল। সবগুলি সে দিয়ে দিল ভিখারীদের। তারপর আমাকে টেনে নিয়ে এল একেবারে পূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে।

বাড়ি ফেরার পথে আমরা বুঝতে পারলাম কারা যেন আমাদের অনুসরণ করছে। আমাদের কয়েক ধাপ পিছনে যে দলটা ছিল

তার মধ্যের অনেকে কয়েকদিন আগে চীনাদের হয়ে খুব হৈ-হৈ করেছিল।

"আমাদের পিছু নিয়েছ কেন ?" আমি থমকে থেমে ওদের মধ্যের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই লোকটা আমার কাছে কিছুদিন চাকরের কাজ করেছিল।

"মনিবজি !" বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আমাকে রাস্তার একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপে চুপে বলল, "আমি যখন খেতে পাচ্ছিলাম না, উপোসে দিন যাচ্ছিল, তখন তুমি আমাকে খেতে দিয়েছ। এইজন্যে আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তোমার জন্যে কিভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সব খবর জানিয়ে তোমাকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিলাম। তোমার নিমক খেয়েছি আমি, তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ফাঁদটা কি আবার ?"

সে বলল, "পার্লামেণ্টে তুমি চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবার পর থেকে তারা তাদের গুপ্তচরদের তোমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে।"

"সে গুপ্তচর কারা ?"

"চীনাদরদীদের কয়েকজন—আমিও তার মধ্যে একজন।"

"তোমার উপর কি রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?"

সে বলল, "তুমি রাজনীতিজ্ঞ। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কি সেই নির্দেশ। তিব্বতী বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যে-সব কথাবার্তা বল, তাদের কাছে তার বিবরণ পৌঁছে দেওয়া।"

বললাম, "তাহলে চীনারা তোমাকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছে, বলো।"

"বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে তারা আমাদের বেশ ভালোরকম পারিশ্রমিক দেয়।"

"যথা—"

"এই দেখ-না। তোমার সঙ্গে দু'জন তিব্বতী আছেন, এঁরা

পুরোপুরি চীনবিরোধী। ধরো, চীনারা যদি স্থির করে যে এদের একেবারে উহ্য করে দিতে হবে, তবে তার জন্যে বেশ মোটা রকম খরচ তারা করবে। কিন্তু আমি শপথ করছি, তোমার কোনোরকম ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।"

"তোমরা এমন সাংঘাতিক কাজও কর?"

"আমাদের দল ভাড়া খাটে। প্রত্যেক কাজের মজুরি একটা আছে।"

বললাম, "তোমাদের এই জঘন্য কাজের কথা তুমি এমন খোলাখুলি-ভাবে বলতে ভরসা করছ? দাঁড়াও, আমি পুলিসকে জানাব।"

সে হাসল। তার এই হাসির কারণটা প্রথমে পরিষ্কার হল না। পরে বুঝলাম, সত্যিই ভরসা যেন তাদের আছে। সে বলল, "যা-ই হোক, তোমার নিমক খেয়েছি বলে তোমাকে সাবধান করে দিলাম।"

আমাদের এই ভূমির উপর বসে চীনারা এ-ধরনের বীভৎস ষড়যন্ত্র করতে পারে, এ-খবর জেনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কিন্তু এ আর কি। এর চেয়ে বড় বড় বিস্ময়কর ব্যাপার যে জমা হয়ে আছে আগে তা বুঝিনি।

তিব্বতের ব্যাপারটার পরিণতিতে মন মুষড়ে গিয়েছিল। পরের দিন পার্লামেণ্ট থেকে আমি বড়ই মনমরা হয়ে ফিরলাম। আমার তিব্বতী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে আমার সঙ্কল্প তখনও অটুট। এমন সময় বেজে উঠল কলিং বেল। দরজা খুলেই দেখি, একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভিতরে ঢুকেই বললেন, "সার্, একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি। আশা করি, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা পাব।"

"কি ঘটনাটা?"

তিনি বললেন, "চীনা দূতাবাস আমাদের জানিয়েছেন যে আপনার বাড়িতে দু'জন মারাত্মক তিব্বতী দুর্বৃত্ত লুকিয়ে আছে। আমরা তাদের ধরতে চাই, এবং চীনা কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের দিয়ে দিতে চাই। অবিলম্বে তাদের তাঁরা নির্বাসিত করবেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠিক কি ধরনের অপরাধ তাঁরা করেছেন সে সম্বন্ধে চীনা দূতাবাস কিছু জানিয়েছেন ?"

"যে চৈনিক দূত আমাদের দপ্তরে এসেছিলেন, তাঁকে এ-ব্যাপারে খুব উত্তেজিত দেখি। তিনি বললেন যে, এই দু'জনকে আমেরিকা তিব্বতে খুব গোপন সামরিক তথ্য সরবরাহের জন্যে নিযুক্ত করে। লামার পোশাক-পরিহিত লোকটি চীনা সেনাবাহিনীর কতকগুলি দলিলপত্র চুরি করেছে। চীনের অন্তর্গত তিব্বত থেকে সে বিস্তর সোনাও পাচার করেছে। তার সঙ্গের ওই মেয়েটি আমেরিকার একজন সাংঘাতিক গুপ্তচর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের জার্মান স্পাই মাতাহারির সঙ্গে ওর তুলনা করা চলে। চীনারা এই রকম অভিযোগ করেছে যে, ওই মেয়েটা বারো-চোদ্দ জন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাকে ও তিব্বতে অধিষ্ঠিত চীনা সেনানায়ককে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে। চীনা দূতাবাস নাকি আরও জানতে পেরেছেন যে ওই দুই দুর্বৃত্ত এখানে বিদেশীয় এক দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় আছে, যাতে তাদের কোনো নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্যে, যেমন করে হোক তাদের রুখতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ ধরনের অভিযোগে দিল্লী পুলিসকে কি করতে হবে না-হবে, সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার অধিকার চীনাদের কি আছে ?"

"তাদের দেশের প্রজার অপরাধের শাস্তির জন্যে তারা আমাদের অনুরোধ করে।"

"একেবারে সোজাসুজি ভাবে ?"

"আমাদের পররাষ্ট্র-দপ্তর মারফত তাঁরা আসতে পারেন। কিন্তু

চীনের সঙ্গে ভারতের এই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের জন্যে পররাষ্ট্র-দপ্তর মারফত আসাটা একটা সৌজন্য মাত্র। আমরা সময় নষ্ট করতে চাই নে। কেননা, ইতিমধ্যে অপরাধীরা গা-ঢাকা দিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ সে-সম্বন্ধে কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে, ইতিমধ্যে আমি ওদের পাকড়াও করতে এসেছি।"

বললাম, "আইন এভাবে নিজের হাতে নেওয়া কি ঠিক হবে?"

"তাহলে চোর ও খুনেদের আমরা কিভাবে ধরব?"

"আইনের বিধান অনুযায়ী।"

"আইনের ব্যাখ্যাও আমাদের হাতে। যে-কোনো লোককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আমাদের আছে।"

এই কথা বলে তিনি অনেকগুলি আজগুবি ব্যাপারের কথা বললেন। তাঁর কথায় বুঝলাম কাউকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। তারপর আমাকে তিনি পরামর্শ দিলেন, "এ-সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াবেন না। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমি অভিযোগের কাগজপত্র নিয়ে আসছি, এবং কিছু পুলিসবাহিনীও।"

তাঁর কথা অনুযায়ীই আমি চলব, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি সশব্দে তাঁর মোটরবাইক হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

আমার তিব্বতী অতিথিরা সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছেন। চীনাদের হাতে তাঁদের সমর্পণ করে দিতে হবে—এই প্রস্তাব শুনে তাঁদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাবার সময়েও কোনো মানুষের মুখ অমন বিবর্ণ ও ভয়ার্ত হয়ে ওঠে না।

পেমা বলল, "আমাদের দিন শেষ হয়েছে, আর কোনো চিহ্ন থাকবে না আমাদের। ভারতের আইন সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। এখানে এমন অনেক কমিউনিস্ট আছে, এবং তথাকথিত মৈত্রী সমিতির

এমন অনেক সভ্য আছে, যারা চীনাদের জন্যে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক তথ্য গুপ্তভাবে সংগ্রহ করছে। কিন্তু তাদের ধরা হচ্ছে না, কেননা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না। এইজন্যে তারা অবাধে বিচরণ করে বেড়াতে পারছে। তাদের উপর নজর কত! তাদের সামান্য মাথাধরার খবর পেয়ে তাদের মনিব তাদের যখন পিকিঙে নিয়ে যেতে চায়, তখন ভারতীয় পাসপোর্ট পেতে তাদের অসুবিধে হয় না। শুধু তাই নয়, তারা যখন ফিরে আসে, তখন চীনা দূতাবাসে তাদের সংবর্ধনা হয়, তখন ভারতরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান অনেকেই সেই সংবর্ধনা-সভায় উপস্থিত থাকেন।"

লামা সাংগে রিমপোচে বললেন, "আমি একটা ঘটনা জানি। রাজনৈতিক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত একজন ফেরার ভারতীয় কমিউনিস্টকে চীনা রাষ্ট্রদূত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরিচয় করে দিয়ে তাঁকে চীন-ভারত বন্ধুত্বের একজন পৃষ্ঠপোষক ও আদর্শ পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। অনেকেই মনে করেন বিশেষ দূতাবাসটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে হরিহরাত্মা। তাঁদের ধারণা ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে চীনা দূতাবাসের সংস্পর্শ যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ ওই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। নিজেদের অপরাধ ও দুষ্কর্ম চাপা দেবার জন্যে চীনারা ভারতের পুলিসের চোখে ধুলো দিচ্ছে—আমাদের মত নিরীহ ও দরিদ্র মানুষদের প্রতি পুলিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাব চেষ্টা করছে।"

পুলিসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমাদের বিশেষ তৎপর হতে হল। তাড়াতাড়ি আমরা কিছু আম ও ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিলাম। অবিলম্বে আমাদের মধ্যে যেন নূতন প্রেরণা ও প্রফুল্লতা ফিরে এল।

অবচেতন অবস্থা থেকে পেমা যেন ফিরে পেল চৈতন্য, বলল, "এখান থেকে মোটরগাড়িতে হিমালয় পৌছতে কতক্ষণ লাগে?"

"প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।"

"আমার সমাধি হিমালয়ের বুকে হোক—এই আমার ইচ্ছা। চীনাদের অন্ধকারায় যেন আমার মৃত্যু না হয়।"

লামা তাকে সমর্থন করলেন, বললেন, "ঠিক। সেই আমাদের স্বর্গ। সেখানে আমরা দেখতে পাব তুষারাচ্ছন্ন পর্বতচূড়া, যার ওপারেই আছে আমাদের সেই প্রিয় ভূমি—তিব্বত।"

অবিলম্বে আমার অলিম্পিয়া গাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলাম। দিল্লী থেকে হিমালয় যেন আমাদের নাগালের মধ্যে বলে মনে হল।

সাংগে রিমপোচে হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালেন, স্বভাবসিদ্ধ নম্র গলায় বললেন, "অশেষ ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের, লোহার মত কঠিন করতে হবে মন, এবং আর-সব নির্ভর করবে ভগবান তথাগতের উপর।"

৩। হিমালয়ের ছায়ায়

গঙ্গার নিখুঁত এক বাঁকের মুখে আমরা পেলাম অতিরমণীয় সূর্যাস্ত। শান্ত নদীর বুকের উপর অজস্র বর্ণের বন্যা ছড়িয়ে পড়ল। পাটলরঙের এক স্তর মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে দিগন্তের ওপারে অন্তর্ধান করার আগে সূর্যের একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব যেন দেখলাম।

ধোঁয়া ধুলো গুমট আতঙ্ক আর পুলিস—সমতল ভূমির ওইসব অশান্তি দূরে ফেলে এসেছি। নদীর কিনার বরাবরের এই রাস্তাটি হিমালয়ের উপর উঠে গিয়েছে। মনে হল, ওই জায়গাটা বুঝি কত শান্ত এবং কত শান্তির।

গিরিচূড়া থেকে নিম্নে ওই দেখা যাচ্ছে হরিদ্বার। তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ওই ডিম্বাকৃতি দ্বীপটি পূর্ণ। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সব যেন

মুছে গেল—ওই মানবজনতা, ওই শহরতলী এবং খরস্রোতা ওই স্রোতস্বিনী।

পেমা বলল, "এই দৃশ্য দেখে আমার মনে পড়ছে সাংপোর কথা··· তোমরা যাকে বল ব্রহ্মপুত্র। এই নদীর সঙ্গে আমার জীবনের একটি ঘটনা জড়িয়ে আছে।"

"কি সেই ঘটনা?"

পেমা বলতে লাগল, "তখন আমি নিতান্তই শিশু। হঠাৎ নদীতে বন্যা এল। সে এক চরম উত্তেজনার ব্যাপার। আমার যেন মনে হয়েছিল ওই কর্দমাক্ত নদীস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসছে অচেনা কোন্ রাজ্যের অসীম ঐশ্বর্য। সে রাত্রে আমাকে ঘুম পাড়ানো খুব কঠিন হয়েছিল আমার মায়ের। সে রাত্রে আমি বারবারই স্বপ্ন দেখছিলাম যেন প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী কোন রাজপুত্রের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে, বারবারই আমি ভয়ে কেঁপে উঠছিলাম। ভীষণ মূর্তি ধরে ঢেউগুলো আমাকে ঘিরে ধরছিল। মনে হচ্ছিল যেন এক-একটা ঢেউ এসে সব পাহাড়ি ষাঁড়, সব ঘরবাড়ি, সব হাটবাজার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেঝের উপর যেন এসে পড়ছে সেই জলের ধারা, তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে পড়ছিলাম জানলায়। রোষ ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল ওই বন্যার জলের। তার গর্জনে মানুষের কান্না আর পশুর আর্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। এ যেন অপদেবতার এক উন্মাদ নৃত্য। আমার বাবা ওই রোষের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আর যেন পেরে উঠলেন না, তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে আমাকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে বললেন। আমাদের সমস্ত গ্রামটা ধ্বংস হয়ে গেল। যারা ছাদে উঠেছিল রক্ষে পেল শুধু তারাই।"

বললাম, "পাহাড়ের এ অঞ্চলেও ওই ধরনের বন্যা প্রায়ই হয়।"

পেমা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তিব্বতীরা ও ভারতবাসীরা এই হিমালয়েরই সন্তান। পাহাড় ও নদী আমাদের মধ্যে একই আনন্দ

ও একই আবেগ সঞ্চার করে থাকে। ভগবানকে এবং বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা বন্দনা করে থাকি একই ভাবে। তাহলে কেন তিব্বত যুক্ত হয়ে থাকবে ওদের সঙ্গে—ওই অমানুষ চীনাদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই আমাদের কোনো মিল নেই ?"

পিছনের সীটে বসেছিলেন লামা, সেখান থেকে তিনি বলে উঠলেন, "তিব্বত থেকে আমরা ওই চৈনিক হূনদের তাড়াব।"

আমরা যতই উপরে উঠতে লাগলাম, বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল ততই। আমি জানলা তুলে দিতে গেলাম কিন্তু পেমা বাধা দিয়ে বলল, "ওই পাহাড়ি হাওয়া বন্ধ কোরো না। ওই হাওয়া আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার স্বদেশের কথা—আমার তিব্বতের কথা। উপরের ওই বজ্রধ্বনি ও নীচের ওই খরস্রোতা গঙ্গা আমাকে নতুন প্রাণের প্রেরণা দিচ্ছে।"

পাহাড়ি বৃষ্টি প্রায় যখন আরম্ভ হবে, এমন সময় আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা মুসৌরীতে পৌঁছেছি। মুসৌরী—যাকে বলে হিমালয়ের সৌন্দর্যরানী। এই জায়গাটিকে কোনো গবর্নমেণ্ট তাঁদের গ্রীষ্মের হেড-কোয়ার্টার করেন না বলে রক্ষে—উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরেদের মধ্যে যাঁরা একটু নাক-উঁচু, তাঁদের স্বার্থপরতার হাত থেকে তাই এ জায়গাটা বেঁচেছে। যখন ভূস্বামীদের জমজমা অবস্থা তখন তাঁদের আভিজাত্যের নিকেতন ছিল এই মুসৌরী। এখানে তখন গানের জলসা হত খুব, আর হত রানীদের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা। সেই ভূস্বামীদের দিন গত হবার পর থেকে এই পাহাড়তলীতে জীবন-ধারণের খরচ কমেছে, এবং তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে এখানে বাস করা সহজ হয়েছে।

নীচে সুন্দর উপত্যকা, উচ্চে সূর্যের প্রসন্ন আলো—এই দুইটিই এই জায়গার বিশেষত্ব বলা চলে। সমতল ভূমি থেকে খাড়াভাবে সবুজ

তৃণে আচ্ছাদিত পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে এসেছে এবং সূর্যের আলোর সঙ্গে মেঘের লুকোচুরি-খেলা চলেছে প্রায় সারাদিন—অপূর্ব এর সৌন্দর্য। এই আলো আর ছায়ার লীলাখেলার মধ্যে লামা যেন পেয়ে গেছেন এক মহাগ্রন্থ—যার থেকে তিনি তিব্বতের ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে কি আছে তা পড়ে দিতে পারেন।

পাহাড়ের উত্তর কোণের হ্যাপি-ভ্যালী নামে পরিচিত এলাকাটির চূড়ায় বসানো ছোট একটা কাঠের ঘরই ছিল আমাদের লক্ষ্যবস্তু। সেই ঊর্ধ্বলোক থেকে আমরা চারদিকের তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় দেখতে পাচ্ছিলাম—মনে হচ্ছিল যেন চার ধারে শুধুই শুভ্র অরণ্য। তার মধ্যের দুটি পাহাড়কে মনে হচ্ছিল ধ্যানমগ্ন, সে দুটি হচ্ছে বদরীনাথ ও কেদারনাথ।

এই কাঠের ঘরটির মালিক ছিলেন লখনউর এক রাজাসায়েব। জুয়ায় তিনি জিতেছিলেন এই ঘরটি। এবং তাই এটির কথা অচিরে তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন। এটা এমন এক দুরারোহ জায়গায় বসানো যে হাওয়া বদলের জন্যে যারা আসে তারাও এখানে বাস করতে চায় না। এ-এলাকার চৌকিদারও কখনো এতটা উঁচুতে উঠে আসে না। চৌকিদারের মেয়ে গরু চরাতে এসে মাঝে-মাঝে এই ঘরে কেবল বিশ্রাম নেয়।

এই রকম একটা পরিত্যক্ত জায়গাই আমাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। ইতিপূর্বেও আমি এখানে এসেছি, এবং কিছুদিন থেকেছিও। ওই চৌকিদারকে ও তার মেয়েকে কিছু বকশিশ দেওয়ায় তারা খুশি হয়ে থাকতে দিয়েছে।

এবারও আমার তিব্বতী বন্ধুদের নিয়ে রওনা হওয়ার সময় আমার লক্ষ্য ছিল এই কাঠের কুটিরটিই।

আমরা চৌকিদারের মেয়ে তারাকে খুঁজে বের করলাম। সে আমাদের এই ঘরের দরজা খুলে দিল।

পুলিসের তাড়া, চীনা গুপ্তচরদের হুমকি পার হয়ে কুয়াশার রাজ্য ভেদ করে আমরা যেন এসে পৌঁছলাম নিজের ঘরে।

ঘরের ভাঙা সার্সির ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম পূর্ব দিগন্তে আলোর আভাস। ক্রমশঃ ভোরের প্রথম আলো আকাশের অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

দূরে অজস্র রঙের অপূর্ব ছটা। অজস্র ও অসংখ্য নামহীন গিরিচূড়া স্বর্গের প্রহরীর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হচ্ছিল বিশ্বপ্রকৃতির হৃৎস্পন্দনও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

অকস্মাৎ একটা গোলাপি ওড়না যেন সরে গেল, দেখতে পেলাম রাজকীয় গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে আছে দুটি চূড়া।

ঝরনার দিকে যাচ্ছিল পেমা ; ওই দৃশ্য দেখে থেমে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

সাংগে রিমপোচে পাশের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়েছিলেন ধ্যান করার জন্যে। বাইরে খুব ঠাণ্ডা, তবুও তিনি তাঁর গায়ের ধড়াচূড়া খুলে ফেলেছিলেন, হাত দুটি দিগন্তের দিকে প্রসারিত করে যেন অভিবাদন জানাচ্ছিলেন। তিব্বতের সেই গুম্ফার কথা নিশ্চয় তাঁর মনে হয়েছে, সেখানে স্থাপিত আছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নত হয়ে নমস্কার জানালেন। অনেক বার তিনি এইভাবে প্রণাম নিবেদন করলেন।

ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল। পাহাড়ের চূড়া আচ্ছন্ন হয়ে গেল মেঘের আস্তরণে। ক্রমেই সে আবরণ ঘন হয়ে জমে এল, অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য।

ধড়াচূড়া পরে লামা অভিবাদন জানালেন, "নমো বুদ্ধায়।"

আমরাও বললাম, "নমো বুদ্ধায়।"

পেমা খানিকটা তিব্বতী চা তৈরি করেছে। এই চা একাধারে পানীয় ও খাদ্য।

রান্নাঘরে সে আমাদের চা খেতে ডাকল। সে বেশ সুন্দরভাবে আগুন জ্বেলেছে, আমরা সেই আগুন ঘিরে কাঠের গুঁড়ির উপর বসলাম।

সবই এমন মনের মত জুটে যাচ্ছে দেখে সাংগে রিমপোচে মন্তব্য করলেন, "সত্যি বলতে কি, মানুষ-জাতটাই সৃষ্টি হয়েছে প্রেরণালাভ, মধুর সংগীত এবং প্রার্থনার জন্যে।"

পেমা বলল, "তা যদি সত্যি, তবে চীনাদের ধারণা অমন কেন? চীনারা দাবি করে যে তিব্বতীদের জন্ম হয়েছে চীনাদের খোরাক যোগাবার জন্যে।"

"ইতিহাস কখনো এমন দাবি স্বীকার করেনি। পিকিঙের বর্তমান শাসকদের সাম্রাজ্যবাদিতার লোভ এমনই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, তারা ভাবছে তারা সমস্ত হিমালয়টাই গিলে ফেলতে পারবে, এবং তার সঙ্গে সব পাহাড়ি অধিবাসীদের, এমনকি ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ভূমিটি পর্যন্ত।"

"আমার স্থির বিশ্বাস, সব উদরস্থ করার অনেক আগেই চীনাদের পেট ফেটে যাবে।"

"তিব্বতকে হজম করার আগে তাদের ওই পেট ফাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

পেমা যেন অগ্নিসাক্ষি করে বলল, "আমরা তাই করব। নতুন মরণপণ যুদ্ধের প্ল্যান আমরা এখানে বসেই করব।"

বর্ষা পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়েছে। আমাদের মাথার উপরের করোগেটের চালার উপরে প্রবল ধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের নেই।

কিন্তু এই বৃষ্টির সঙ্গে পাওয়া গেল আশীর্বাদের মত পাহাড়ের পরিচ্ছন্ন শান্তি।

মুখের উপর থেকে জলের গুঁড়ো মুছে না ফেলে পেমা বলল, “আমার প্রাণের গান ও আমার দেশের শান্তি নষ্ট করেছে চীনারা।”

বাধা দিয়ে লামা বললেন, “সব সময় তুমি গানের কথা বল কেন। চীনাদের মতলব হচ্ছে তিব্বতী জাতিটাকেই নিশ্চিহ্ন করা। তারা যাকে ‘লিবারেশন’ বলছে, তার মানেই ওই।”

পেমা বলতে লাগল, “সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে তিব্বত একটা নিরীহ দেশ। চীনাদের বিজয়োল্লাসের নীচে আমাদের সব আর্তস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। এইজন্যে বাইরের জগতের বিশ্বাস হচ্ছে চীনাদের কথাই ঠিক। কেউ তাই বুঝতে পারে না যে তিব্বতের এক কোটি অধিবাসীও মানুষ। বুঝতে পারে না যে, আনন্দে আমরাও হাসতে জানি, কষ্টে আমরাও কাঁদি। চীনা আক্রমণকারীরা যেদিন চামদোতে ঢুকল, তখন তারা শহরের নারীদের লাঞ্ছিত করল, শিশু বা বৃদ্ধরাও নিস্তার পেল না। আমাদের সকলের জীবন দুর্বিষহ করল। মুমূর্ষু অবস্থায় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন করে ঠাণ্ডার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। খোলা জায়গায় এভাবে ফেলার কারণ হচ্ছে তাদের ফটোগ্রাফাররা যাতে ছবি তোলার উপযুক্ত আলো পায়। আমাদের চৈতন্যহীন শরীরগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে তারা বাজারের ধারে ফেলল, তারপর ছবি তুলল। ছবি তুলল, তার উদ্দেশ্য ‘লিবারেশনে’র আগে আমরা কেমন ছিলাম তাই বিশ্ববাসীকে দেখানো। তারপর তারা নিয়ে এল ভালো-ভালো খাদ্য, ভালো-ভালো পরিচ্ছদ, আর ওষুধ। তার সঙ্গে এল ভীষণদর্শন, কদর্য ও কুশ্রী তাদের নেতারা। ওই খাদ্য, পরিচ্ছদ ও ওষুধ নিয়ে দাঁড়াল তাদের সমরনেতারা, যেন ওইসব তারা আমাদের মধ্যে বিতরণ করছে। এ-সবই তাদের চিত্রসংবলিত প্রচারপুস্তিকায় প্রকাশের জন্যে করা হল। তিব্বতী জনসাধারণকে ও-সব খাদ্য ওষুধ

পরিচ্ছদ থেকে এক কণাও তারা দেয়নি। কিন্তু প্রচারপুস্তিকা দেখে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—যাক, লামাদের পীড়ন থেকে তিব্বতীরা বাঁচল, ধনী লামাদের শোষণ থেকে এবং তাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি পেল তারা।”

বৃষ্টির ছাটে পেমা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে বলে চলল, “আচ্ছা, এক কোটি তিব্বতীর উপর অত্যাচার এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা করাটা কি কখনো চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়েই থাকতে পারে? ভগবান বুদ্ধের জীবনবাণীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার অপরাধে তিব্বতীদের নিশ্চিহ্ন করার অধিকার কি চীনাদের আছে? কিন্তু ব্যাপার দেখ, সারা জগৎ বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে আছে চীনাদের অসাধারণ কৃতিত্বে।”

চায়ের শেষটুকু নিঃশেষে পান করে লামা বললেন, “যাঁরা নিজেদের কৃষ্টিবান জাতি বলে মনে করেন তাঁদের এই ধরনের নিরাসক্ত আচরণের জন্যে তাঁরা মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্য নন। সভ্য বা কৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা।”

এ-সব শুনে আমি বললাম, “তিব্বতে চীনাদের নৃশংসতার বিষয় আমরা কিছুই জানি না।”

আগুনে কাঠের চেলা দিতে দিতে পেমা বলল, “সেইটেই তো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সমস্ত তিব্বতী জাতি নিঃশব্দে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। বাইরের জগৎ জানবেও না যে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে তারা লড়াই করেই মরেছে; মানুষের যা পরম কাম্য, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে তারা বীভৎস নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছে। মানুষের ইতিহাসে এর কোনো বিবরণ হয়তো থাকবে না। এটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।”

আমি বললাম, “ইতিহাসের ধারা বদলেও যেতে পারে।”

উঠে দাঁড়াল পেমা, বলল, “সেই আশাই আমরা করব। তাই

হোক্। সকলে ফরাসী বিপ্লবের কথা বলে, আমেরিকার, রাশিয়ার চীনের ও ভারতের বিপ্লবের কথা বলে। তারা তিব্বতের বিপ্লবের কথা কেন বলবে না?"

বাইরেটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, তিব্বত বুঝি দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লামা ভবিষ্যদ্বাণীর ভঙ্গিতে বললেন, "বৎসগণ! তিব্বতী বিপ্লব আরম্ভ হয়েই গিয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাকেও একটা সত্য বলে তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।"

একটা দমকা বাতাস ও জলের ছাট এসে আমাদের ঘরের দেয়ালে ঘা দিল, সেই সঙ্গে যেন ভেসে এল পার্বত্য সৌরভ। সেই গন্ধে বুক ভরে নিয়ে পেমা বলল, "আমি যদি আমাদের খাম্বা যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা তুলতে পারি তাহলে সেইটেই হবে সবচেয়ে বড় বীরত্ব-গাথা, এবং যাকে বলে পৃথিবীর ছাদ—সেই উচ্চ মালভূমি তিব্বতেও যে এমন বীর আছে তা জেনে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবে। তাহলে বিশ্বের পূর্ণ সমর্থন আমরা পাব। নিরীহ ও নম্র, খামবাসীর মর্মন্তুদ আর্তনাদের মর্যাদা তাহলে দিতে হবে। ছোটবড় সমস্ত দেশই তখন একবাক্যে বলবে—'পিকিঙের ক্লেদ, তোমরা মানবজাতির ঘৃণার বস্তু, তার লজ্জার সামগ্রী। তিব্বতীদের আত্মাকে নিষ্পেষণ করাই তোমাদের উচ্চাভিলাষ, এবং তোমাদের পীড়নে যখন তারা যন্ত্রণায় চীৎকার করছে তখন তোমরা ভাবছ তোমরা কর্তব্য পালন করলে—কৃষ্টি বিস্তার করলে। তোমাদের 'মুক্তিসেনা' মানুষের শবস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করলে তোমরা মনে কর জগতের অভিনন্দন তোমরা পাবে। সারা তিব্বতে তোমরা জ্বলন্ত নরক সৃষ্টি করতে চাও। এই নরকাগ্নি এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও। আমরা তোমাদের এই জঘন্য ও হীন কাজে বাধা দেবার জন্যে দাঁড়ালাম, অন্য কোনো কারণে না, আমরাও যে মানুষ, কেবল তা প্রমাণ করার জন্যে।'"

গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ও সূর্যের আলো। কখনো ঝাপসা কখনো পরিষ্কার হয়ে উঠছে আমাদের আস্তানা।

কিন্তু এই পার্বত্য পরিবেশটি পেমার উপর বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে।

সপ্তাহব্যাপী প্রবল বজ্রধ্বনি ও বৃষ্টিপাতের পর মুসৌরীর মৌসুমী আবহাওয়া কেটে গেল। চারদিক পরিষ্কার। সকালের আকাশে আবার শুরু হল রৌদ্র ও মেঘের খেলা।

সেদিন লামা ধর্মের নির্দেশমত ভিক্ষায় বেরুলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা গিম্‌টি-প্রপাতের দিকে বেড়াতে গেলাম।

পর্বতের যে যাদুশক্তি আছে তা বোঝা গেল পেমাকে দেখে। দিল্লীতে সে এসেছিল এক বিবর্ণ ও বিষণ্ণ মূর্তি নিয়ে, কিন্তু এখন সে অন্য মেয়ে; সে এখন রূপলাবণ্যময়ী এক স্বর্ণপ্রতিমা। সাধারণ লোকগাথায় যাকে স্বর্ণপরী বলে, পেমা এখন তাই।

আমার হাত ধরে টেনে সে বলল, "চলো, আমরা একটা দৌড় দিই, কে আগে যেতে পারে দেখি।"

কিছুটা দৌড়েই সে থেমে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "উঃ! আমার পা-দুটো কেমন ভারি মনে হচ্ছে। অনভ্যাসে এই রকমই হয়ে থাকে বটে।"

সেই প্রপাতে পৌঁছতে আমাদের হাঁটতে হল প্রায় মাইল-পাঁচেক। লম্বা লম্বা পাইনগাছের ঘন অরণ্য ভেদ করে অপ্রশস্ত এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। তিব্বতের তুষারশুভ্র অঞ্চল পেরিয়ে ভেসে-আসা মুক্ত বাতাসের সুগন্ধ আমাদের বুক ভরে দিচ্ছিল। যাতে কেউ না পড়ে যাই এইজন্যে হাতধরাধরি করে আমরা চলেছি। আমাদের পায়ের নীচে পাইনের ঝরা পাতার মোটা কার্পেট।

বৃষ্টিতে ফুলে উঠেছে গিম্‌টি—অনেক উঁচু থেকে সে ঝাঁপ দিয়েছে

অনেক নীচে। ভাবেনি এর পরিণাম। নূতন সৃষ্টির আবেগে গিম্‌টির এই উল্লসিত অভিযান।

যে-পথে ইতিপূর্বে কেউ পা দেয়নি, এমনি একটা পথ ধরে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। রাস্তাটিতে অসংখ্য আচমকা বাঁক, প্রত্যেকটি বাঁকের মুখে এসে আমরা ওই স্রোতস্বিনীর কূলে কূলে নূতন নূতন দৃশ্যের সাক্ষাৎ পেতে লাগলাম। অবশেষে আমরা উপস্থিত হলাম গিম্‌টি ও যমুনার সঙ্গমস্থলে।

পেমা ভাল করে জেনে নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল, "তোমাদের দেশের বড় বড় নদীর উৎস কি হিমালয় নয়?"

বললাম, "হিমালয় থেকেই তাদের উৎপত্তি।"

পেমা বলল, "আমাদের সাংপোরও।"

এই জায়গাটা ভালো করে দেখার পর হঠাৎ আমাদের সঙ্গে দেখা হল এক যুগলমূর্তির। আমাদেরই বয়সী দু'জন বিদেশী নারীপুরুষ। দু'জনের পরনেই স্নানের পোশাক। মেয়েটি জলের কিনারায় গিয়ে যেন ওর গভীরতা পরীক্ষা করছে, তার ইচ্ছে স্রোতের ওপারের ওই বিরাট গুহাটিতে সে যাবে—দেখা যাচ্ছে গুহাটির ছাদ দিয়ে জল চুয়ে চুয়ে এসে বড় বড় ফোঁটায় নীচে পড়ছে বৃষ্টির মত।

মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "এই এই! হিল্‌ফে—হিলফে[১]!"

পেমা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখে ভয় পেল মেয়েটি?"

বিদেশী লোকটি হেসে বলল, "কুমির দেখে।"

পেমা তার দিকে চেয়ে বলল, "ওই জলের জীবেরাও কি চীনাদের মত অতটা নিষ্ঠুর?"

এই কথা বলেই সে এগুতে এগুতে বলল, "ওই মেয়েটার সঙ্গে আমি আলাপ করব।"

---

(১) হিলফে—বাঁচাও (জার্মান)

আমরা দেখতে পেলাম ওরা আলাপ করছে—কথার বিনিময়ে নয়, ভাবভঙ্গি দিয়ে। কিন্তু তাদের গলার স্বরে একটা হাসির ফোয়ারা যেন ফিনকি দিয়ে উঠল। ওরা দু'জনেই জলে নামল। সাঁতার দিল। মনে হল জলের বোর্ডের উপর তারা যেন ক্যারম্ খেলছে। তারপর ঠিক করল ওপারের ওই গুহায় তারা যাবে।

সেখানে গিয়ে চুয়ে-পড়া সেই জলের ধারার নীচে তারা দাঁড়াল। তাদের ওই রূপে দেখে মনে হল কোনো নৃত্যপটীয়সী ব্যালেরিনাও বুঝি অমন সুন্দর নয়।

তারা নাচতে লাগল। সে নাচ হচ্ছে—'স্বর্গদূতের জাগরণ'। মর-জীবনে তারা ফুটিয়ে তুলল সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য।

আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। বিদেশী ভদ্রলোকের নাম উইলি ক্র্যাফ্ট। তিনি বার্লিনের একজন সাংবাদিক। আর, মেয়েটি তাঁর স্ত্রী—নাম হানা। ভিয়েনা থেকে তাঁরা এসেছেন।

পেমা তিব্বতী, এই কথা শুনে তিনি আরম্ভ করলেন তিব্বতের প্রসঙ্গ। বললেন, "পৃথিবীর লোকের ভুল ধারণা হয়েছে যে ভারতবর্ষ তিব্বতকে খুব নাচারে ফেলেছে। তোমাদের দেশে আসার আগে শান্তি ও অহিংসা নিয়ে এত কলরব আমাদের কানে এসেছে যে আমাদের মনে হয়েছিল এশিয়ার রাজনীতি থেকে বুঝি রণতাণ্ডব নির্বাসিত হল। কিন্তু চীন যেভাবে তিব্বতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আরম্ভ করল তার কাছে ইথিয়োপীয়ায় মুসোলিনীর বর্বরতা ও পোল্যাণ্ডের ইহুদীদের প্রতি হিটলারের নিষ্ঠুরতাও যেন ম্লান হয়ে গেল। চীনারা তাদের নিষ্ঠুরতার জন্যে খ্যাত বটে, কিন্তু বিশ্ববাসী আশ্চর্য হয়েছে তিব্বতকে ভারতবর্ষ তেমন সক্রিয় সাহায্য করতে পারছে না দেখে, পঞ্চশীলের নামে মানুষের উপর এই ব্যভিচার দেখে। এই ভুলের জন্য ভারতবর্ষকে আরও মাশুল হয়তো দিতে হবে—ভারতবর্ষ সমেত এশিয়ার আরো অনেক

দেশে হামলা করতে চীনারা উৎসাহিত হবে। পঞ্চশীলের পাঁচটি শীলের মধ্যে যেন মানুষের প্রতি অত্যাচারের এই নীতিটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা ভয়চকিত হয়েছি এই কথা ভেবে যে, এর পর চীনারা তাদের সীমান্তের পরপারের অন্যান্য দেশে অভিযান চালিয়ে আরো কত অনাচার ঘটাতে পারে।”

ওরা দুজন ফিরে এসেছে—পেমা ও হানা। স্কুলের মেয়েদের মত দু'জন দু'জনের হাত ধরাধরি করে, এবং তিব্বতী ভাষায় ও জার্মান ভাষায় গান করতে করতে।

আমরা সকলে একসঙ্গে মুসৌরীতে ফিরলাম। পিছনে অন্ধকার আকাশ, তার উপর নানা রঙের আলো জ্বলে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন শূন্য থেকে ঝুলে আছে সংখ্যাহীন রত্নদীপ। তারপর আমরা বিদায় নিলাম। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলাম। শার্লে-ভিল হোটেলের ফটকের মুখে আমরা ছাড়াছাড়ি হলাম। ওঁরা এই হোটেলে উঠেছেন।

সে রাত্রে ঘুমতে যাওয়ার আগে পেমা জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তিব্বতের সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে তুমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটি নষ্ট করছ ?”

সাংগে রিমপোচে আমার হয়ে উত্তর দিলেন, বললেন, “অপরের বিষয়ে কথা বলা তোমার উচিত নয়।”

তিব্বতে নতুন কি ঘটনা ঘটছে তার সংবাদের প্রত্যাশায় আমাদের দিন কাটতে লাগল। সেই সঙ্গে আমাদের জীবনেই বা কি পরিবর্তন ঘটে তার জন্যেও অপেক্ষা করছিলাম। কেননা, আমরা জানতাম, আমাদের ভাগ্যে সত্বরই কিছু-না-কিছু হবে। এইভাবে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করতে হল।

অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এসে গেল সেই পরিবর্তন। ভারতভূমি ত্যাগ করে আকাশপথে আমি যাত্রা করলাম তিব্বতে।

৪। আকাশ-পথে তিব্বতে

মুসৌরীর প্রবেশপথে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে লাইব্রেরি-বাজার। এখান থেকে দুন-উপত্যকার যে বিস্তৃত এলাকা চোখে পড়ে সেটিকে বলা যায় সৌন্দর্যের নিকেতন। এখানে আসা কষ্টকর নয়, এইজন্যে এখানে বিভিন্ন রুচির অনেক লোকের জমায়েত লেগেই আছে।

একদিন বিকেলবেলায় পেমার জন্যে কিছু মিষ্টি কিনে আমি আমাদের সেই পাহাড়-চূড়ার কুটিরে ফিরছি, এমন সময় পথের ধারের এক চায়ের দোকানের জানলা দিয়ে কে যেন আমাকে ডাকল, "ডক্!"

সেদিকে চেয়েই আমি চিনতে পারলাম তাকে, বললাম, "পল্!"

বিমান-চালনার ইনি ছিলেন আমার ইনস্ট্রাক্টর, এবং তারপর ইনি অনেক অপরিজ্ঞাত এলাকায় বিমান চালনা করেছেন—কাঞ্চনজঙ্ঘা, নাঙ্গা পর্বত ইত্যাদির উপর দিয়ে ঘুরে এসেছেন। ওঁর ডাকটা বরাবরই ওই ধরনের—নতুন কোনো অভিযানের আহ্বান।

আমাকে চা খেতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বললেন, "তিব্বতের ব্যাপারে তোমার সমর্থন তোমার রাজনীতির পাখা যেন ছেঁটে দিয়েছে; পাখা কাটা পড়েছে বটে, কিন্তু আশা করি তুমি ওড়া একেবারে ছেড়ে দাওনি।"

"কিছুদিন যাবৎ সত্যিই আকাশে উঠিনি।"

"তাহলে এখন আরো উঁচু আকাশের দিকে ধাওয়া করা দরকার।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিভাবে?"

সে বলল, "বিমানচালনায় তোমার যেমন সহজাত ঝোঁক, তুমি ইচ্ছে করলেই চারদিকের এই নোংরামি দূরে ফেলে অসীম উচ্চতার আনন্দলাভ করতে পার। তোমার সেই এল-৫ বিমানটি কি হল ?"

"তার জ্বালানির খরচ জোটাতে পারছিনে।"

"সময়টা এখন খারাপই বটে। কিন্তু এখানকার এই মনমরা পরিবেশটি ত্যাগ করে তোমার উচিত হচ্ছে যে-কয় ঘণ্টা বিমানচালনা করা একান্ত দরকার, অন্তত সেটুকু অভ্যাস রাখা।"

"তোমার কাছ থেকে উৎসাহ পেলে, আশা করি, কিছুটা আকাশ-বিহার করতে পারব।"

"বেশ তো। কালকে এস, যদি ইচ্ছে হয় খানিকটা উড়ে আসা যাবে।"

"কোথায় যাব ?"

"সে কথা অবান্তর। আমার বিমানে নতুন ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে —সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"তোমার বিমানটা কি বিমান ?"

"এটা হচ্ছে একটা বেসরকারী 'ডাকোটা' বিমান। আসামেই এটা চলাচল করে। কিন্তু অন্য কোনো ভাড়া পেলে সেখানেও যায়।"

তার কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু তুমি তাহলে এখানে এলে কি করে, কি জন্যে ?"

"এক নববিবাহিত দম্পতি মধুযামিনী যাপনের জন্যে মুসৌরী এসেছে—তারাই ভাড়া নিয়েছে বিমানটি। কিন্তু এর সবচেয়ে কাছের বিমান-নামানোর মাঠটি হচ্ছে সাহারানপুর। আজকের আবহাওয়া দেখে এক কাপ চা খাওয়ার লোভে আমি এখানে উঠে এসেছি।"

"কিন্তু এখন তুমি কোন্ দিকে যেতে চাও ?"

সে বলল, "আমাদের বিমানে নতুন ডি সি-৪ ইঞ্জিন লাগানো

হয়েছে। এই ইঞ্জিন নিয়ে কত উঁচুতে ওঠা যেতে পারে তার পরীক্ষার জন্যে আমরা বেশ খানিকটা উড়তে পারি।"

বললাম, "চমৎকার। আজ সকালে কেদার-বদরী দেখে অভিভূত হয়েছি।"

"ওই দিকে যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি?" বলেই সে মুচকি হাসল, বলল, "আমরা তিব্বতের উপরেও যেতে পারি।"

প্রস্তাব শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, বললাম, "কখন রওনা হব আমরা?"

"আমাদের যদি নিজেদের গাড়ি থাকত তাহলে রাত দুটোর সময় মুসৌরী থেকে যাত্রা করতে পারতাম। সেইটেই হত সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।"

বললাম, "এখানেই আমার অলিম্পিয়া গাড়িটা আছে। কোথা থেকে তোমাকে তুলে নেব, বলো।"

"এইখান থেকেই। এই চা-খানা থেকে। এর মালিক আমার বন্ধু। আমার জন্যে সে সর্বদাই একটি ঘর রেখে দেয়। তার স্ত্রীও অতি চমৎকার মহিলা—তিনি ভোটিয়া, কিন্তু তিব্বতই তাঁর আদি নিবাস। অপূর্ব সুন্দর তিনি, হলিউডের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দেয় সে-সব সুন্দরী তাঁর কাছে কিছু না।"

বললাম, "আমি একজন তিব্বতী মেয়েকে চিনি। তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে যেন যাদু মেশানো আছে।"

তিব্বতে যেতে পারব—এই কল্পনাটাই অবিশ্বাস্য। দূরে ওই যে কুয়াশাচ্ছন্ন উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়া, ক্রমেই তা যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। আগামী সকালে আবহাওয়া ভালো থাকবে, ওটা তারই লক্ষণ।

আমার গাড়ি থেকে আমি ভারতবর্ষের পথ-ঘাটের ম্যাপটা নিয়ে

এলাম, এবং যে পাহাড়ে বসে লামা উপাসনা করেন সেখানে সেটা পেতে নিলাম। তারপর আকাশপথে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করার সময় যে-সব সীমারেখা অতিক্রম করে যেতে হবে সে-সব খুঁটিনাটি দেখতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে ম্যাপটাতে কেবল পথ-ঘাটই নয়, পর্বতশিখর ও নদীসমূহের উৎসও চিহ্নিত ছিল। আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা অতি সহজেই গঙ্গোত্রী থেকে নন্দাদেবী পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশ অনায়াসেই পার হতে পারব বলে বুঝতে পারলাম।

পেমা আর লামার আনন্দ আরো বেশি। তাদের ধারণা, কেউ যদি হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে পৌঁছতে পারে তাহলে তার মত রোমাঞ্চকর কাণ্ড আর-কিছু হতে পারে না।

পেমা বলল, "তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি সর্বদা প্রার্থনা করব।"

লামা ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করলেন, "অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা তোমাদের শক্তি দেবেন যাতে তোমরা ওই শয়তানদের—তিব্বতকে ও হিমালয়কে কলুষিত করেছে যারা—তাদের বিনাশ করতে পার।"

আমি যখন গাড়িতে উঠে বসলাম, গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে নেমে গেলাম, সকলে তখন ঘুমে অচেতন। পলও নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসেছে।

শুধু ইঞ্জিনের টানে নয়, আমাদের যেন মনে হতে লাগল পিছন থেকেও কে যেন ধাক্কা দিয়ে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে। তখনও অন্ধকার। তবু আমাদের মনে হল আগামী সকালের আলো যখন আসবে আমরা তখন এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করবই।

পল একজন অভিজ্ঞ পাইলট। সে বলল, "জান, হিমালয়ের উপর দিয়ে ওড়া কিংবা পৃথিবীর ছাদ বলে পরিচিত তিব্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিমান-চালনার বিজ্ঞানের

উন্নতি হয়েছে অনেক। এখন আকাশ ভেদ করে লক্ষ লক্ষ মাইল উঠে যাওয়া যায়, এবং চন্দ্রের বা সূর্যের বা মঙ্গলগ্রহের চারদিকে একটা উপগ্রহের মত পাক খাওয়াও আর কল্পনার জিনিস নয়।"

বললাম, "আমাদের দেশ এখনো অত অভিযানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।"

"এর কারণ আমাদের প্রত্যহের ছোটখাট সমস্যাই কঠিন সংস্কারের নাগপাশে আমাদের বেঁধে রেখেছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়েও সে শক্তি বড়, তাই তা পৃথিবীর উপরেই আমাদের এমন কঠিনভাবে বাঁধতে পেরেছে।"

"এই জিনিসটাই মানুষের মনুষ্যত্বকে খাটো করে দিচ্ছে।"

"ঠিক। ফসিল খুব শান্ত বটে, কিন্তু তা মৃত—তা অতীতের চিহ্ন মাত্র। যে জিনিস তুমি নিত্য-নূতনভাবে গড়ে না তুলতে পার, তাকে কখনো জীবন বলা চলে না।"

কথায় কথায় আমরা বিমান-ক্ষেত্রে পৌঁছে গেলাম।

বিমানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন বৈমানিক, তিনি বললেন, "সব তৈরি। ট্যাঙ্ক তেলে ভর্তি। ইঞ্জিনও গরম করা হয়েছে।"

আমাকে সহ-পাইলটের সীটে বসতে বলে পল বলল, "এবার আমরা যাত্রা করি।"

পূর্বদিগন্তের রক্ত-মেঘের ফাঁক দিয়ে প্রথম আলোর ইঙ্গিত দেখা গেল। ঊষাদেবীর প্রসন্ন মুখ উৎসাহিত করল আমাদের। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু জ্বলজ্বল করছে। পাশেই বৃষ্টির জল জমে আছে খানিকটা জায়গায়, সেই জলের আরশিতে ছায়া পড়েছে বিমানের সেই অংশের যেদিকে আমি বসে আছি। ওই ছায়ায় আমি যেন কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম আমার তিব্বতী বন্ধুদের।

বিমান গর্জন করে উঠল। অনুভব করলাম এই অজানা পথে

যাত্রার প্রারম্ভে এক অজ্ঞাত শক্তি। বিমানের গিয়ার টানা হল, ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগলাম। মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনে শোনা—

'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।'

পৃথিবীর স্পর্শ ছেড়েছি আমরা, আমরা এখন আকাশে। নীচে ওই আম্রকুঞ্জ, তারই নীচে বসে আছে এক ফকির, মাথা তুলে সে তাকাল উপরে, মনে পড়ল সাংগে রিমপোচের কথা, মনে পড়ল তাঁর আশীর্বাদের কথাও, "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।"

দ্রুতগতিতে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা এসে গেলাম হরিদ্বারের আকাশে। গঙ্গার দ্বারা বেষ্টিত ওই পবিত্র দ্বীপটি দেখে মনে হল আকাশচুম্বী পর্বতমালার সম্মুখে বসে যেন ধ্যানমগ্ন এক সন্ন্যাসী।

সাদা এক চাপ মেঘের মুখে এসে আমরা ঝাঁকি খেলাম। কলকব্জার দিকে চেয়ে পল বলল, "গঙ্গার ধার বরাবর যাওয়াই ভালো।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। ওই ধারা ধরে একেবারে উৎসমুখে—গঙ্গোত্রীতে।"

"সে তো সোজা।"

আমাদের বাঁয়ে শিকারের জন্যে সংরক্ষিত বন। সেই গভীর অরণ্য নিদ্রামগ্ন। গঙ্গার ধারা এঁকেবেঁকে গিয়েছে, ওই ধারা দেখে মনে হল পাহাড়ের বেড়া ভেঙে ফেলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে যেন ছুটে চলেছে ওই নদী। নিসর্গেরও মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা এমনি প্রবল।

আরো উপরের দিকে সবুজ পাহাড় ক্রমেই উঁচু হয়ে চলেছে। সেই পাহাড়ের খাঁচে নদীর ধারা দেখে একটা আঁকাবাঁকা তলোয়ারের ফলা বলে মনে হল সেটাকে।

পল অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, "ওই দেখ। ওই যে দুই নদীর সংগম—ওই দুটি হচ্ছে ভাগীরথী আর অলকনন্দা। অলকনন্দা-বরাবর গেলে বদরীনাথের চূড়ায় পৌঁছব, ভাগীরথী-বরাবর গেলে পৌঁছব গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রীতে।"

আমি বললাম, "আমরা ভাগীরথী ধরেই চলি, চল।"

সম্মুখের দৃশ্যাবলী অবিকল একটা রঙ্গালয়ের ভিতরের দৃশ্যের মতন। দূরের সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সবুজ পর্বতমালা ঢেউ খেলে খেলে উঠে গিয়ে তুষারশুভ্র পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। সম্মুখের দৃশ্য এমনই মনোমুগ্ধকর যে এর সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। গঙ্গার দুটি বাহু দুদিকে বিস্তারিত, পর্বত-শিখরের দিকে প্রসারিত। বাম দিকের বাহুটির শোভাই বেশি মনোরম।

ক্রমে ক্রমে আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠল তুষারের একটা মস্ত স্তূপ দূরের রজতরেখা ডিঙিয়ে। এর আকার অনেকটা জন্তুর মত। ক্রমেই তা স্পষ্ট হতে লাগল। এবং এটা কি তা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সহজ হল। ইতিমধ্যে আর-একটা ছুঁচলো চূড়াও চোখে পড়ল, আকাশকে যেন সেটা খোঁচা দিচ্ছে। এবার আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বাঁ দিকে ওই চূড়াটা হচ্ছে বন্দরপঞ্চ-মাংকি টেল-পিক—এর উচ্চতা ২৭,৭২০ ফুট।

সিমলা থেকে অন্য কোণ থেকে এই পাহাড়টি ইতিপূর্বে আমি অনেকবার দেখেছি। সূর্য অস্ত যাবার সময় নাগাদ যখন বরফের উপর স্কীয়িং খেলা খেলতাম তখন ওই পাহাড়টির উপর সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ায় ওটাকে দেখাত অবিকল যেন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে। এই খেলায় আমার সঙ্গী মেজর জয়াল একবার ওই চূড়ায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন।

আজ কেউ ওই চূড়ার উপরে নেই। সম্ভবত ওই অশরীরী মানুষটি

ওখানে নেই বলেই গঙ্গোত্রীর থেকে বন্দরপঞ্চকে ছোট দেখাচ্ছে, গঙ্গোত্রীর উচ্চতা কিন্তু অনেক কম—২১,৮৯০ ফুট।

হিমালয়ের রজতরেখাটি ঠিক আমাদের চোখের নীচেই। এখান থেকে মনে হচ্ছে পর্বতমালা যেন তার হাজার হাজার বর্শাফলক আমাদের দিকে উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো ওখানে দেবতাদের আবাস, তাঁরা সম্ভবত তাঁদের ধবল শরীর দিয়ে আমাদের বিমানের পাখা স্পর্শ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের এই স্বর্গীয় শান্তি নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে খুব কম লোকই। অতীতে যাঁরা এ-চেষ্টা করেছেন তাঁরা পরাস্তও হয়েছেন। আমাদের দখলে আছে শক্তিশালী বিমানের ইঞ্জিন, এরই বলে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির রোষ শান্ত করতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে ভীতিসঞ্চার করতে তাঁরা পারছেন না। নিস্তরঙ্গ শান্ত হ্রদের উপর দিয়ে যেন আমরা ভেসে চলেছি—এই রকম মনে হতে লাগল আমাদের।

পলের খুব উৎসাহ, সে বলল, "আমরা আরো এগিয়ে যাব। সঙ্গে অনেক অক্সিজেন আছে—শ্বাস নিতে কষ্ট হলে কোনো অসুবিধে নেই।"

বললাম, "যখন দেবদর্শনে আমরা যাই, তখন মন্দির প্রদক্ষিণ করে থাকি। এই পবিত্র গিরিচূড়ার চারপাশ একবার ঘুরব।"

গঙ্গোত্রীর আড়ালে হঠাৎ হারিয়ে গেল ভাগীরথীর ধারা।

আমরা গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে লাগলাম। হঠাৎ শুভ্র কুয়াশার আড়াল থেকে নতুন একটা চূড়া দেখা গেল। এটা ২০,১২০ ফুট উচ্চ শ্রীকান্ত। এর নামে থেকে এই পর্বতের কান্তি কেমন মনোহর তা বোঝা যায়, এবং কি রকম স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে এর অবস্থান তাও আন্দাজ করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

আমাদের চারদিকে যে-সব শৃঙ্গ, তা কেউ কখনো আরোহণ করেনি। এর বেশির ভাগ শৃঙ্গে মানুষের পদার্পণ করার সম্ভাবনা

এখনো সুদূর। যে তিন-চারটিকে খুবই ক্ষুদে বলে দেখাচ্ছে, সেগুলিতে অবশ্য অনেক দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পদচিহ্ন পড়েছে। এই দুঃসাহসীরা মৃত্যুকে দেখে ভয় পাননি। কিন্তু তবুও তাঁদের কাছেও এই শৃঙ্গমালা দুরারোহই আছে।

আমরা যা দেখলাম, প্রকৃতির চিত্রশালার সে একটা মাস্টারপিস। শিল্পের ক্ষেত্রে সে একটা চরম সৃষ্টি। রূপকথাতেও কেউ এমন দৃশ্যের কল্পনা করেনি। প্রকৃতির এই কারুশিল্প দেখে সেই স্বর্গীয় সুষমার মধ্যে আমরা যেন আত্মহারা হয়ে গেলাম। কেবল ওই সৌন্দর্যের সঙ্গেই নয়, অসীমের সঙ্গেও আমার যেন আত্মীয়তা ঘটে গেল।

এতে আমাদের মুখ বাক্যহীন হয়ে গেল, এক কথায় আমরা অবাক হলাম। যেন শ্বাসও পড়ছে না, একই সঙ্গে আনন্দের ও ভীতির যুগপৎ সঞ্চার হতে লাগল মনের মধ্যে। আমাদের অস্তিত্বের কথাই প্রায় ভুলে গেলাম। সম্মুখে কেবলই শূন্য—কেবলই শূন্য। যেন একটা জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে আছি, প্রাণও আছে, তবু যেন লাভ করেছি নির্বাণ।

হঠাৎ আমাদের প্লেন যেন উপুড় হয়ে গেল। খানিকটা গোঁৎ খেয়ে গেল বিমানটা। ভীত-শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, দেহ অবসন্ন হয়ে এল।

চারদিক নিস্তব্ধ। তার মধ্যে আমাদের প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দটা সেই স্তব্ধতাকে জুড়ে আছে। দু'জন কথাবার্তা বলছে—পাইলট ও মেকানিস্ট—

"গঙ্গোত্রীর শৃঙ্গের নীচে নিম্নমুখী হাওয়ার মধ্যে এসে গেছি আমরা।"

"আমরা নীচুমুখী প্রচণ্ড বাতাসের পাল্লায় পড়েছি।"

"গঙ্গা বরাবর সমুদ্র অবধি যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।"

"কিন্তু ঘোরা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।"

"শৃঙ্গটার পাক খেয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।"

"একমাত্র পথ এখন—সোজা চলা।"

"সেই দিকেই তিব্বত। এবং হয়তো সেখানে গিয়ে কোনো ঝড়হীন এলাকা পাব, এবং সেইখান দিয়ে ফেরা যাবে।"

"আবহাওয়া জেনে নেওয়ার জন্যে বার্তা পাঠালে কেমন হয়?"

"এই অঞ্চলে কোনো অবজার্ভেশন পয়েন্ট নেই।"

"তাহলে যতক্ষণ ওড়া সম্ভব ওড়াই ভালো।"

"আরো পাঁচ ঘণ্টা।"

"লম্বা সময়। অক্সিজেন যথেষ্ট আছে তো?"

"এখন থেকেই কম করে খরচ করতে হবে।"

"আমি হাওয়া আসার জন্যে ছাদটা ফাঁক করে দিচ্ছি।"

হঠাৎ বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল আমার মুখে। এতে আমার সংজ্ঞা যেন পুরো ফিরে এল। চোখে পড়ল তাঁবুর আকারের একটি শিখর। চকচকে তুষারে চোখের দৃষ্টিই যেন বদলে গিয়েছে—এ দৃষ্টি যেন বাস্তব দৃষ্টি নয়।

তুষারে নির্মিত একটি মূর্তি চোখে পড়ল—যেন তুষারে গড়া একজন সন্ত। দুধের মত সাদা অরণ্যটি যেন তাঁর জটা। তুষারপ্রবাহ নেমে আসছে সেই জটা থেকে। গলিত ইস্পাতের মত সূর্যের রশ্মি যেন যাদুকরের যষ্টির মত স্পর্শ করল ওই মূর্তিটিকে। অমনি দেখা দিল চৈতন্য। তুষারপ্রবাহটি জীবন্ত হয়ে উঠে যেন মুক্তিলাভের জন্যে ছুটতে আরম্ভ করল।

কে যেন আমার কানে কানে বলল, "গঙ্গার জন্ম।"

সম্পূর্ণ চেতনা লাভ করলাম। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও আমি বেশ রোমাঞ্চিত আনন্দ বোধ করলাম। তুষারের শ্বাসের মধ্যেও যেন নূতনত্ব আছে—তার সৌরভ যেন মিষ্টত্বে ভরা।

পাইলট জিজ্ঞাসা করল, "তোমার অসুস্থতা কেটেছে ?"

"আমি কি অসুস্থ হয়েছিলাম ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"যা-ই হোক, ঝড়ের ঝাপটা থেকে আমরা ছাড়া পেয়েছি।"

"এখন আমরা কোন্ দিকে চলেছি ?"

"তিব্বত।"

"ওই পথের বিশ্বপ্রকৃতি নিশ্চয়ই অতিথিকে অনাদর করবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"আরো এগিয়ে গেলে কি হবে বলতে পারছিনে। যখন তুমি ঝিমোচ্ছিলে, আমরা তখন নীচুমুখী ঝড়ের ঝাপটে পড়ে একটু বিব্রত ছিলাম। ওর থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাদের নিতে হয়েছে তিব্বতের পথ।"

মেকানিস্ট বলল, "এইজন্যে মৃত্যুর হাত থেকেও বেঁচেছি।"

পাইলট বাধা দিয়ে বলল, "যখন নিজের ইচ্ছায় তুমি হিমালয়ের উপরে এসেছ, এখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করা ঠিক না। কেবল একটা সংকল্প রাখলেই হল যে, কোনো শৃঙ্গে গিয়ে ঘা যেন না দিই। তাহলেই আমরা নিরাপদ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন আমরা কোথায় ?"

কোল থেকে ম্যাপটা সরিয়ে পাইলট বলল, "আমরা মানা-গিরিপথের উপরে। এই গিরিপথের উচ্চতা ১৮,৪১০ ফুট। আমরা এখন পৃথিবীর সেই ছাদের ঠিক মাঝখানে পৌঁছেছি। এই এলাকাটা এখনো অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। এই ম্যাপগুলো নিখুঁত নয়, এইজন্যে এতে যে দূরত্ব দেখানো আছে তাতে অনেক সময় সব গোলমাল হয়ে যায়।"

আমাদের সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবলই দেখতে পাচ্ছি এবড়োখেবড়ো ভূমি। এখন প্রবলভাবে হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে

আমরা যেন বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি। এখানেও আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হল, কিন্তু এ-ভীতির সঙ্গে খুশিও মেশানো ছিল।

পাইলট জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ পথ ধরব ?"

"যদি সোজা যাই, তবে কোথায় পৌঁছব ?"

"গারটকে। এখানে চীনারা জমায়েত হয়েছে। এখানে তারা খুব গোপনে লুকিয়ে আছে। বাধ্য হয়ে আমাদের যদি ওখানে নামতে হয়, তাহলে ওরা আমাদের আস্ত রাখবে না, আমাদের কাঁচা মাংসই খেয়ে ফেলবে, হয়তো নুনও মিশিয়ে নেবে না।"

মেকানিস্ট বলল, "ওই চীন-চ্যান-চীনাম্যানের উদরে বাস করার ইচ্ছে আমার নেই।"

দেখতে পেলাম ওই উঁচুনীচু জমির উপরে, কিছু দূরে, একটা যেন দাগ—যেন জমিটা দু'ভাগ করা। কোনো সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও, কিন্তু গাঢ় গোলাপী পাহাড় এবং ঘননীল ওই জলরেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে।

পাইলট বলল, "দেখ। ওই শতদ্রু। আমার জন্মভূমি থেকে ওই ধারা বয়ে আসছে। দেশে ফেরার সময় ওই ধারা ধরে উড়ে যাব।"

শতদ্রু ক্রমেই নিকটে আসছে। ওই জলধারা দেখে পাইলট তার অঙ্গুলি নির্দেশ করে করে বলতে লাগল, "আমাদের দেশের যে-সব নদী আমাদের জীবনতুল্য, তার উৎসমুখ এই এলাকায়। চীনারা তা জোর করে দখল করে আছে ; সেইসঙ্গে তারা অধিকার করেছে কতকগুলি পবিত্র গিরিশৃঙ্গও। এখানে তারা কি জন্যে আছে ? কোনোই কারণ নেই। আমাদের এইসব পবিত্র ভূমিতে পদপাত করার কোনো যুক্তি তাদের নেই। অনাদি অনন্ত কাল থেকে এই অঞ্চল আমাদের তীর্থ-ভূমি, এবং আমাদের প্রেরণালাভের উৎস। এবার বল, কোন্ দিকে যাব ? শতদ্রু এখানে দু'ভাগ হয়েছে—একভাগ গিয়েছে পুবে, একভাগ পশ্চিমে।"

মেকানিস্ট বলল, "পশ্চিমে। এখান থেকে সেই সুন্দর গিরিপথ—শিপকি-লা—বেশি দূর নয়। ওই পথেই আমরা গৃহে ফিরতে পারব, এমনকি রোটাং-গিরিপথ পর্যন্তও যেতে পারব।"

"ওই গিরিপথেই পাণ্ডবেরা স্বর্গে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেছিল বলে বলা হয় না?" এই মন্তব্য করেই পাইলট বলল, "এত শিগগির আমার স্বর্গে যাবার ইচ্ছা নেই। সুতরাং ও-পথে আমি যেতে চাই না।"

আর, প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের দিকে গেলে আমাদের সোজাসুজিভাবে প্রবল বাতাসের মুখোমুখি হতে হত। আমাদের মনের বল ও বিমানে জ্বালানি জিইয়ে রাখাও খুব দরকার ছিল।

আমরা শতদ্রুর পূর্ব-শাখা ধরে চললাম।

এবার সোজা সামনের দিকে দূরে আমরা চমৎকার একটা শৃঙ্গ দেখতে পেলাম। এতক্ষণ যতগুলো শৃঙ্গ দেখেছি তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে সুন্দর। নীচের বিশাল এক জলাশয়ে সে নিক্ষেপ করেছে তার ছায়া, অতি প্রশান্ত দেখাচ্ছে ওই ছায়াটি।

পাইলট ফিসফিস করে বলল, "কৈলাস। তার পাশে ওই গুরলা-মান্ধাতা—উচ্চতা ২৫,৩৫৫ ফুট। নীচে ওই মানস সরোবর।"

তাহলে আমরা মহাদেবের নিকেতনে পৌঁছেছি। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অধীশ্বর ওইখানে বাস করেন। তাহলে আমাদের বর্তমানের, অতীতের ও ভবিষ্যতের উৎস ওইখানে।

ওই শৃঙ্গের পশ্চিম দিকের ঢালু থেকেই পঞ্চনদের উৎপত্তি, যাকে আমরা বলি সিন্ধু। ব্রহ্মপুত্র ওরই পূর্বদিকের ঢালু থেকে জন্ম নিয়েছে। আমাদের মাতৃভূমির দুটি বলিষ্ঠ বাহু হচ্ছে এই দুই নদ, একটি গিয়ে পড়েছে আরব সাগরে, অন্যটি বঙ্গোপসাগরে।

আমাদের ডান দিকে সারি সারি শ্বেত স্তম্ভ—উপরের আকাশ ওই স্তম্ভের উপর যেন দণ্ডায়মান। ওইসব স্তম্ভ-সদৃশ শৃঙ্গের যে কয়টি

আমরা চিনতে পারলাম সেগুলি হচ্ছে গঙ্গোত্রী, বদরীনাথ, ২৫,৪৪৭ ফুট উচ্চ কামেত এবং ২৫,৬৪৫ ফুট উচ্চ নন্দাদেবী। ওইসব গিরি থেকে অজস্র নদী বয়ে নেমে আসছে, এবং এইসব নদী কেবল আমাদের মাতৃভূমিকে উর্বরই করছে না, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি দান করছে এবং আমাদের প্রত্যেককে জীবন দান করছে।

প্রকৃতির কল্পনার জমাট সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম আমরা।

গুরলা-মান্ধাতা—ওর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল মেজর জয়ালের সঙ্গে ওই চূড়ায় ওঠার পরিকল্পনার কথা। কিন্তু সে প্ল্যান কাজে লাগানো যায়নি। কেননা, আমার সঙ্গীটি তার আগেই ২৬,৮৭০ ফুট উঁচু চাউ-আউ শৃঙ্গে উঠতে গিয়ে মারা গিয়েছেন।

বিমানবিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে কৈলাস-শৃঙ্গে পৌঁছনোও এখন কত সহজ হয়েছে।

১৬,৬২৮ ফুট উঁচু নিতি-গিরিবর্ত্মের চারধারে আবহাওয়া বড় খারাপ। পিছন থেকে বাতাসের ধাক্কায় আমরা দ্রুতবেগে সম্মুখে এগিয়ে চলেছি। ডান দিকের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পাইলট বলল, "এখান থেকে আমরা ঘরে ফেরার সংকল্প নিই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা এখন কোথায় ?"

"দরমা গিরিপথের উপর।"

"শুনতে অনেকটা যেন ধর্ম ? অর্থাৎ নীতি। বৌদ্ধরা যার উচ্চারণ করে ধম্ম।"

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" পাইলট বলল, "বুদ্ধই আমাদের শরণ।"

ওই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সম্মুখে এল আর একটি দৃশ্য। নন্দাদেবী ও নন্দকোটের মাঝখানে ভালো আবহাওয়া পেয়ে আমরা পিণ্ডারী হিমপ্রবাহের উপর এসে পৌঁছেছি।

তুষার সীমা পিছনে ফেলে এসেছি। পিণ্ডার নদীটি আমাদের যেন

নির্দেশ দিল সমতলভূমির। দূরে ঘন অরণ্য দেখা যাচ্ছে। ভুল হবার নয়। ওই পিণ্ডারী হিমপ্রবাহ এলাকার দৃশ্য আমার মনের উপর এমন দাগ এঁকে দিল যে সে দাগ বুঝি আর মুছবে না।

স্বচ্ছন্দে আমরা রানীখেত ও নৈনিতালের উপরে উড়ে এলাম। পাহাড়ি হ্রদের উপর দুটি পাল-তোলা নৌকো ভাসছে। আমরা যে উচ্চতায় ছিলাম, সেখান থেকে নৌকোর ওই দুটি পাল দেখে মনে হচ্ছে যেন খামের সেই মেয়েটির জলপাইয়ের মত দুটি চোখ।

স্বর্গতুল্য পর্বতশোভার পরিবর্তে চোখে ভেসে উঠল এই মর্ত্যেরই স্বর্গদূতের কথা।

নীচে সবুজ ঘাসে ঢাকা মসৃণ ভূমি দেখে আমরা স্থির করলাম এখানেই নামব। নিশ্চয়ই এটা হালদোয়ানি।

জলের উপরে যেমন নেমে আসে হাঁস, তেমনি আমরা নেমে পড়লাম।

পিছন ফিরে তাকালাম। ঘন কুয়াশায় ঢাকা ওই পর্বতমালা। তারই নিভৃতে আছে স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ সেই মেয়েটি—যাকে আমি আত্মীয় বলে বোধ করেছি।

এখন বুঝতে পারছি ওরা আমার কে, আমার দেশবাসীরই বা কে, এবং আমার দেশেরই বা কে।

৫। সুন্দরীর ষড়যন্ত্র

আকস্মিকভাবে হঠাৎ তিব্বতের উপরে পৌঁছে যাওয়ায় আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। হালদোয়ানি থেকে তেল ভরে নিয়ে আমরা আবার আকাশে উড্ডীন হলাম। সাহারানপুরে রাত্রে নামার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে আমরা দিল্লীর দিকে চললাম। দিল্লীতে পৌঁছবার

পর বরাতে কি আছে ভেবে পাইলটের মনে একটু ভয় ছিল। সে বলল, "যদি জানতে পারে তাহলে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ আমাদের এই কাজের জন্যে খুব গালাগাল দেবে, এমনকি শাস্তিও দিতে পারে। সুতরাং ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।"

পাইলটের মনে সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, "যা-ই হোক না কেন, আমাদের এই অভিযানের জন্যে আমরা কিন্তু অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।"

মেকানিস্ট বলল, "একবার ভেবে দেখ। বদরীনাথ কৈলাস মানস সরোবর—এ-সব জায়গায় তীর্থ করতে যেতে হলে কত মাস ধরে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়; কিন্তু দেখ, কত আরামে আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ার চারধার ঘুরে এলাম।"

পাইলট বলল, "আমরা খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়ে উড়ে এলাম—এতে কারো কোনো ক্ষতি করা হয়নি। আকাশে ওড়াটা আর ভগবানের দয়ার উপরেও নির্ভর করে না, প্রকৃতির মর্জির উপরেও না। পঞ্চভূতের উপর মানুষের এখন যথেষ্ট দখল জন্মেছে, এইজন্যে দুর্যোগের মধ্যেও সাফল্যের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো আজকাল সম্ভব হয়েছে। যদি বিমান-বিজ্ঞানের উপর তোমার যথেষ্ট অধিকার জন্মায়, তা হলে ভীতু ভাব কেটে যাবে এবং সাংঘাতিক অভিযানও স্বচ্ছন্দে করে আসতে পারবে।"

মেকানিস্ট তার কথায় সায় দিয়ে বলল, "আর, এর দ্বারা দরকার হলে কাজের কাজও করা যায়। মনে কর, যদি একদিন হিমালয় পর্বত ও তার গিরিপথগুলি আমাদের রক্ষা করতে হয় তখন এই রকম বিমান-চালনা কতটা কাজে লাগবে আন্দাজ করে দেখ।"

পাইলট বলল, "যাক গে। এখনকার মত আমরা ও-সব ভুলেই না হয় থাকি।"

দিল্লীর সফদরজং বিমানঘাটিতে আমরা যখন নামলাম, তখন চারিদিক গোধূলিতে ছেয়ে আসছিল। পৃথিবীর সঙ্গে এই স্পর্শ লাভ

করা মাত্র আমাদের মনে দৈনন্দিন সমস্যার কথা এবং তার অত্যাশ্চর্য সমাধানের কথা মনে হল। কক-পিট থেকে বেরিয়ে আসাটা যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়া। বিমানে তালা লাগিয়ে আমরা টাওয়ারের দিকে চললাম।

ওই দালানে ঢোকবার বড় ফটকের চারধারে ফুলের সমারোহ। দেখে আশ্চর্যই লাগল, এই দারুণ তাপের মধ্যে ফুলের গাছগুলো বেঁচে আছে কি করে; শুধু বেঁচে থাকাই নয়, রংবেরঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলই বা ফোটাল কি করে? সিঁড়ির উপর একদল মহিলা দাঁড়িয়ে। দূর থেকে তাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তাঁদের শাড়ির রংবাহার দেখা যাচ্ছিল। ওই রংদার শাড়ি যেন ওই ফুলদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। অনেকের হাতেই ফুলের তোড়া, হয়তো রাজনীতির কোনো নায়ককে কিংবা কোনো ধনপতিকে অথবা কোনো সৌন্দর্যরানীকে অভ্যর্থনা করতে তাঁরা এসেছেন।

কিন্তু আমরা ও-সব সৌভাগ্যবানের মধ্যের কেউ নই। সেইজন্যে আমাদের নোংরা পোশাক ও ধুলোমাখা মুখের দিকে কেউ তাকাল না। আমরা যে নগণ্য তা মেনে নিয়ে আমরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম—এইমাত্র শ্রীনগর থেকে একটা সার্ভিস প্লেনে করে কয়েকটি যাত্রী এসেছেন, তাঁদের পথ করে দিলাম। ওঁদের মধ্যে ছিলেন একজন মহিলা—জমকালো সাজে সজ্জিত হওয়ায় তিনি যেন যাত্রীদের মধ্যে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন। ভিপ্‌দের সংরক্ষিত এলাকায় রাখা গাড়ির দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। সেখানে গাছের নীচে ঝকমকে একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে। একটা লতার কঠিন আলিঙ্গনে গাছটির বৃদ্ধি একেবারে থেমে গিয়েছে। গাছটি যেখানেই একটু স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করেছে লতাটি সেইখানেই তাকে চেপে ধরেছে, তার ফলে গাছটি কিম্ভুতকিমাকার একটা কদাকার চেহারা ধারণ করেছে।

মহিলাটি গিয়ে সবুজ পাতায় ও লাল ফুলে ছাওয়া লতাটির পাশে

দাঁড়ালেন, হয়তো ওর সঙ্গে তুলনা করলেন নিজের, একটু হাসলেন, হয়তো পেয়ে গেলেন মিল। ওই লতার গায়ের লাল ফুলগুলো অবিকল ওই মহিলারই মত যেন।

পাইলট আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "পরমরমণীয়।"

বুঝতে পারলাম না, সে ওই লতার কথা বলল, না ওই মহিলাটির কথা।

সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা দল বেঁধে তাঁর ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা তাক করেছেন এবং তাঁকে একটু হাসিমুখে দাঁড়াতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। পাকা সিনেমা স্টারের মত তিনি সহাস্যে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করছেন।

বিমানঘাটির সংবাদদাতা তাঁর কাছে আসতেই তিনি হাতব্যাগ খুলে একটি কাগজ বের করে ডিক্টেশন দেওয়ার মত দ্রুত পড়ে গেলেন— "রাজধানীর এই নিদারুণ উত্তাপ সত্ত্বেও আমি একদিনের জন্যে এখানে ফিরে এসেছি কেবলমাত্র একটি কারণে—চীন-ভারত মৈত্রীর খাতিরে। এই দুই মহান্ দেশ তিব্বত সম্বন্ধে যে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেছে তার বার্ষিকী আগামীকাল। এশিয়ার ও পৃথিবীর ইতিহাসে এ একটি স্মরণীয় দিন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের উৎসব ও অভ্যর্থনা আগামীকাল সম্প্রতি-উদ্বোধিত অশোকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে। আমি সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করব।"

এইসব কাজ সেরে তিনি ইউনিফর্ম পরিহিত ক্যাডিলাক ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি একা এসেছ কেন?"

"আজ সকালের প্লেনে মহীশূর থেকে যে ফুল এসেছে তা দিয়ে মালা গাঁথতে দেওয়া হয়েছে চাঁদনি চকে। সাহেব ও শেঠজি সেই মালা আনতে গিয়েছেন। তাঁরা এখনি এসে পড়বেন। আপনার বিমান নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছনোয় আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার সব প্ল্যান ভেস্তে গিয়েছে।"

"হুঁ। একজন লোককে কিভাবে সংবর্ধনা জানাতে হয় তাও তারা জানে না।"

আশেপাশে কোনো চেনা লোক আছে কিনা দেখার জন্যে তিনি মাথা ঘোরালেন এবং আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন, আহ্লাদের সঙ্গে বললেন, "আ, ডক্টর—কি আশ্চর্য, তুমি!"

"আমার নাম তোমার মনে আছে দেখছি!"

"তা থাকবে না কেন। তুমিই আমাকে বরফে স্কেট করতে শিখিয়েছ। জেনেভাতে না প্যারিসে কোথায় যেন! ও, না না, সে তো ফ্রাঙ্কফোর্ট-সুর-সেনের পাম-গ্যার্ডেনে। মনে পড়ছে না তোমার?"

অবশেষে আমি চিনলাম তাকে।—রানীসাহেবা বিমলা।

সুইজারল্যাণ্ডে আমি যখন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ছিলাম, তখন প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয় জেনেভায়—সেখানে সে ফরাসি শিখছিল। লক্ষ্ণৌর এক নামকরা বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে সে, ব্রিটিশ আমলে এই পরিবারের অনেকে অনেক খেতাব পেয়েছে। শিশুকাল থেকেই ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখেছে। তার বাপ-মা তার জন্যে অনেকবার পাত্র যোগাড় করেছে, কিন্তু সে সবগুলিই বাতিল করে দিয়েছে। সে নিজেই নিজের জন্যে পাত্র ঠিক করতে চেয়েছিল, এমন পাত্র যাকে সে নিজের কব্জার মধ্যে রাখতে পারে এবং নিজের ইচ্ছেমত যাকে সে ভেঙে-তুমড়ে নিতে পারে। অবশেষে এমনি একটি পাত্র সে পেয়েছিল—পাত্রটি এক রাজপরিবারের ছেলে এবং বেশ বড় সরকারী চাকুরে, লোকটি বিপত্নীক এবং বয়সের দিক থেকে তার বাবার বয়সী। যারা তাকে চিনত তাদের সকলকে চমকে দিয়ে এবং বাপ-মায়ের মতের বিরুদ্ধে সে বিয়ে করল সাদা-চুলে-মাথা-ভরা সেই গণ্যমান্য সরকারী অফিসারকে যিনি 'রাজা'ও বটেন; বিয়ে করল, কেননা, প্রথম দর্শনেই সে নাকি ভালবেসে ফেলেছে তাঁকে।

তার স্বামীসহ সরকারী কাজে আমেরিকায় যাবার পথে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে

তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। আমার হাতে স্কেট দেখে সে আমার কাছে এসে জানাল সে বরফের উপর নাচ শিখতে চায়। হাঁদা ধরনের মেয়ে দেখে আমি তাকে একা একাই নাচতে বললাম।

এখন সে এক হোমরাচোমরা মেয়ে, নিজের রূপের জন্যে এবং সরকারী মহলে স্বামীর প্রতাপের জন্যে সে এখন একজন মস্ত মহিলা। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের ধারণা যে, এই মেয়েটি অনেক সরকারী নীতি নির্ধারণে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

নয়াদিল্লীর কূটনৈতিক ফ্যাশন ও রুচি অনেকটা চীন-দরদের দিকে—এই ভেবে নিয়ে রানী বিমলা এখন যা-কিছু চীনা তারই মস্ত ভক্ত হয়েছেন—চীনা কাপড়, গলাবন্ধ ব্লাউজ, কাঠের চপ-স্টিক থেকে আরম্ভ করে নাকী উচ্চারণ পর্যন্ত। এ-সব জিনিসের প্রতি আমার টান নেই দেখে সে বিরক্ত—দিল্লীর কয়েকটা অভ্যর্থনা-সভায় তার সঙ্গে আমার দেখা হতেই এ মনোভাব বুঝতে পারি। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও, ফ্র্যাঙ্কফুর্টে আমি যে স্পর্ধা দেখিয়েছি সেকথা সে ভোলেনি, তাই বলল, "তুমি আমাকে রিজেক্ট করেছিলে। এখন কাছে এসো তো, বলো তো তোমার সেই সোনিয়ার কথা—যাকে নিয়ে তুমি সেদিন বিকেলে বরফের উপর নেচেছিলে। কি যেন নাম তার—সোনিয়া না তোনিয়া?"

"সেদিনের পর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।"

"একেই আমি বলি ভাগ্য। তারপর আর কেউ জুটেছে? শুনতে পাচ্ছি একটা তিব্বতী মেয়েকে নিয়ে তুমি নাকি পাগল। পৃথিবীর মধ্যে ওরা সবচেয়ে নোংরা মানুষ না? চীনারা তাদের মধ্যে সভ্যতা আনছে। এই তিব্বতী মেয়েটি নিজের মুখটা অন্তত ধুতে শেখা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

তার কথায় বাধা পড়ল, তার গলায় মালা দিতে এসে কে যেন ডাকল, "রানীসাহেবা।"

রানী বিমলা তার দিকে ফিরে বলল, "শেঠ মোটু-মল! তোমার গাড়িটা কি তোমার ভারে চুপসে গিয়েছে?"

সে বলল, "না। ইঞ্জিনটা শুধু হাঁসফাঁস করেছে, আর ওর কাঠামোটি ঢিলে হয়ে গিয়েছে। যদিও চীনাদের তুলনায় আমার মেদ কম।"

"তিব্বতে তুমি যে ব্যবসা করার জন্যে চেষ্টায় আছ, সেটা জাঁকিয়ে আরম্ভ হলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে—অমন মোটা তুমিও হতে পারবে।" তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "শেঠজির চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ এঁর নাম মোটু-মল হয়েছে কেন। কালিম্পঙের মত ছোট জায়গায় তাঁর ছোট একটা ব্যবসা ছিল—ইনিও ছিলেন বেশ রোগা-পটকা। তারপর তিব্বতী এলাকায় চীনাদের মালপত্তর দেওয়ার এজেন্সি পাওয়ার পর থেকেই এঁর হাল ফিরেছে এবং এখন কেমন হয়েছেন স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ। ইনি আমাদের ভারত-চীন মৈত্রী সংঘের কোষাধ্যক্ষ। ইনি খুব উদার, মুক্তহস্ত—"

একটু থেমে রানী বিমলা বলল, "আমার স্বামী আসছেন।"

তার স্বামী এলে তাকে সম্বোধন করল, "ডার্লিং ডিয়াল। সরকারী কাজের চাপে পড়ে তোমার শরীরের হাল কি হয়েছে, এমন রোগাই হয়েছ যে তোমাকে খুঁজে পেতে হলে আমাকে চশমা পরে নিতে হবে। দেখ তো, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার চামড়া ঝলসে গেল। বল, এ ক্ষতির পূরণ হবে কিসে।"

মোটু-মল বলল, "অশোকা হোটেলের সবচেয়ে ভালো স্যুট তোমার জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছে।"

"আমার ভাগ্যকেই ধন্যবাদ দিই। হোটেলটা বেশি দূরে না। বিমানঘাটির লাগোয়াই।" বলতে বলতে রানী বিমলা ঝুলন্ত লতায় হাত রেখে গাড়ির মধ্যে ঢুকল।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "কাল আমাদের ফাংশানে এস।

তাহলেই তোমার গা থেকে ওই তিব্বতী নোংরামি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে।"

তুই হাত প্রসারিত করে পল এগিয়ে এসে বলল, "অভিনন্দন, অভিনন্দন!"

"কি ব্যাপার?"

"আমাদের মালিকের উপর তুমি অসাধারণ প্রভাব খাটিয়েছ। ওই যে মোটু-মল—যে প্লেনে আমরা উড়ে এলাম, ওটা ওর। রানী বিমলা যে রকম ভাবে তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে তাতে সে অভিভূত। তোমাকে অশোকা হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠাল। আমাদের জন্যে ওরা একটা ঘর ঠিক করেছে, বেশ আরামে থাকতে পারবে ওখানে।"

"তোমার মোটু-মল লোকটা কি ধরনের?"

"কি আর বলব। লেখাপড়াও জানে না, কালচার-ফালচারও নেই। কোনো সেন্টিমেন্টেরও ধার ধারে না। টাকা জমানোর দিকে ওর ভীষণ ঝোঁক, খরচ করার দিকে কঞ্জুস, কিন্তু তবুও লোকটি বেশ ইণ্টারেসটিং। মোটা মুনাফা হবে জানলেই কেবল ও টাকা বার করে।"

হোটেলের দরজায় ইউনিফর্ম পরা খুব লম্বা ও শক্তসমর্থ একজন দাঁড়িয়ে ছিল—আমাদের ট্যাক্সির দরজা খোলার জন্যে সে এগিয়ে এল। এবং আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল।

আমরা যেন নতুন জগতে এসে পৌঁছলাম। চমৎকার ঠাণ্ডা, আশ্চর্যজনকভাবে বিলাসবৈভবে পূর্ণ।

আমাদের মধ্যেরই একজন বলল, "এই স্বর্গরাজ্যটা ভালো করে দেখ। দিল্লীর তাপ থেকে বাঁচার জন্যে আর কাউকে হিমালয়ে বা ইউরোপে যেতে হবে না।"

"সব এয়ার-কণ্ডিশন্ড্। ভারতবর্ষের মধ্যে এইটি সবচেয়ে ভালো হোটেল।"

"ভারতবর্ষের মধ্যে কেন, এশিয়ার মধ্যেও। এমনকি বোধ হয়, পৃথিবীর মধ্যেও। এর আর উন্নতি কি সম্ভব?"

"কিছুতেই না। এইটেই চরম ভালো। এটা তৈরি হয়েছে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে।"

কাউন্টারে গিয়ে পল জানতে চাইল আমাদের জন্যে কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে; এবং উপরতলায় বস্‌কে ফোন করতে চেষ্টা করল। আমি তাকাতে লাগলাম চারদিকে। অজন্তার ফ্রেস্কোকে কপি করা নয়, যেন তার আরো উন্নত সংস্করণই এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ-সব আমার ভালো লাগল না। মনে হল, যেন আর্টের নামে কিছুটা বাড়াবাড়ি।

একজন বিদেশী অতিথি ওই পথে যেতে যেতে এই দেয়ালচিত্রের প্রশংসা করলেন। হোটেলের অফিসার ভদ্রলোকটি সম্ভবত একজন রিটায়ার্ড সিভিল সার্ভেন্ট এবং শিল্পসমালোচক, তিনি এই প্রশংসা শুনে খুশি হলেন।

আমাদের মেকানিস্ট ওই চিত্র সম্বন্ধে অন্যরূপ মন্তব্য করল, বলল, "আমাদের ভারতীয় জীবনের প্রতীক ওই চিত্রাবলী। চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন আমাদের দেশের মেহনতী মানুষ; আর এর সৌন্দর্য হচ্ছে যেন সঞ্চিত দৌলত।"

কিন্তু প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গেল। পল এসে বলল, "বস্ তোমার সঙ্গে কিছু কাজের কথা বলতে চান। লিফ্‌টে যেতে হবে। কাজ সেরে তুমি আমাদের কামরায় এস।"

মোটা হরফে কামরার বাইরে লেখা আছে 'মোটু-মল'। বয় দরজা খুলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

একটা চওড়া সোফার উপর ভুঁড়ি বার করে বসে আছে মোটু-মল। তিনজন মজবুত লোক মোটা মোটা গাছের কাণ্ডের মত তার পায়ে মর্দন করে চলেছে। সাদা ধবধবে পোশাক-পরা নাপিত তার নাকের ও কানের চুল ছেঁটে দিচ্ছে।

ভারী গলায় মোটু-মল বলল, "সময় নষ্ট করব না। ওদের কাজ ওরা করুক, সেই ফাঁকে আমি তোমার সঙ্গে কথা সেরে নিই। আচ্ছা বল তো, তিব্বতে চীনাদের সঙ্গে আমার ব্যবসাকে দেশবিরোধী কাজ বলে পার্লামেণ্টে তুমি আমাকে আক্রমণ করেছিলে কিনা। তুমি বোধ হয় জান না যে, লামাদের জাতীয় নীতি মেনেই আমি ব্যবসা করি, এবং আমি একজন দেশভক্ত এবং একজন দাতা? তিব্বতে চীনা সেনাদের আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিলাম হয়তো। কিন্তু সে কেবল সেইসব তিব্বতী গুণ্ডাদের সায়েস্তা করার জন্যে—যারা তিব্বতে চীনা শাসনে বাধা দিয়েছিল এবং আমার ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করেছিল। আমি যে মুনাফা করেছি, আমি তা কি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিই নি? তাদের ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্যে চীনারা ভাগ পেয়েছে, এশিয়াতে চীনাদের এই সভ্যতাবিস্তারে কমিউনিস্ট পার্টির সহানুভূতির জন্যে তারাও ভাগ পেয়েছে, নানা স্থানের মাতব্বরেরা ইলেকশনের খরচ হিসাবে ভাগ পেয়েছে। তাছাড়া আমি গোশালা স্থাপন করেছি। এখন আমি ভারত-চীন মৈত্রীর জন্যে খরচ করছি। ভেবে দেখ, আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি করাটা হচ্ছে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে পাপ কাজ করার সমান—যে পাপের জন্যে পাপীদের ভগবান নরকে পাঠান।"

সে বলতে লাগল, "পার্লামেণ্টে তোমার বক্তৃতা কেউ শোনেই নি। যাদের বিদেশী বউ পুষতে হয় ও ইংরেজি হালচাল বজায় রেখে চলতে হয়, তাদের পক্ষে আমাদের মত ব্যবসা ছাড়া গতি কি। আমি তোমাকে কাজে লাগাতে চাই। আমার পাইলটের কাছে শুনলাম

তুমি বিমান চালাতে পার। কিন্তু তা দিয়ে আমার কাজ নেই। তোমার মত একজন পদস্থ লোক আমার দরকার, দিল্লীতে বসে যে চোখ রাখবে কোনো রাজনীতিবিশারদ যেন আমার ব্যবসার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। তুমি তাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পার, বুঝিয়ে বলতে পার যে আমাদের এই গরিব দেশটা যেন চীনাদের বন্ধুত্ব না হারায়।"

একই নিশ্বাসে সে ব্যবসা ও রাজনীতির কথা বলে গেল। এবং কথায় বাধা দিতে দিল না। কিন্তু মর্দনের জন্যে শরীরটা ঘুরিয়ে নেবার সময় একটু থামল, তারপর বলল, "বল, কত মাইনেয় তুমি এ কাজ করতে রাজি।"

বললাম, "আমি কোনো চাকরি এখন চাচ্ছিনে।"

"তাহলে আমার পাইলটটা তোমাকে সঙ্গে নিলে কেন। আমরা যে-সব এলাকায় আকাশ থেকে মাল সরবরাহ করতে যাই, তুমি হিমালয়ের ওপারের সেই অঞ্চল ঘুরে এলে। চীনারা আমাকে মোটা টাকা দেবে বলেছে। তুমি যদি নেভিগেটর হয়ে ওই বিমানে যেতে চাও, আমি তোমাকে তাহলে মোটা মাইনে দিতে পারি।"

"না। চাইনে।"

"তাহলে রানীসাহেবা বিমলা তোমার হয়ে আমাকে অত কথা বলল কেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব। যা-ই হোক, আমার ক্ষতি করার চেষ্টা কোরো না। আমি তোমাকে বলে রাখছি—আমি মানুষটি সাচ্চা, তাই ভগবান আমাকে ভালোবাসেন। জানো, লক্ষ্মীর আমি বরপুত্র। আমার দৃষ্টি সর্বদা সত্যের দিকে। সকলকে আমি দেখি। উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে অনাথ আতুর ভিখারী—সকলকে। একথা মনে রেখো, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

দরজায় মৃদু ঘা পড়ল, কে একজন এগিয়ে এসে বলল, "মিস লী

এসেছেন দূতাবাস থেকে—আপনি তাঁকে ভোজসভায় ও নাচে নিমন্ত্রণ করেছেন।”

শেঠ মোটু-মলের গলার স্বর এমনিতেই চড়া, কিন্তু এখন স্বর আরো চড়িয়ে সে বলল, “বয়, শিগগির, শিগগির! কি আহাম্মক আমি! চটপট আমাকে নাচের আচকান পরিয়ে দাও। লণ্ডন-কাট স্যুট পরে আমি বল-নাচ নাচব।”

চীন-ভারত মৈত্রী সংঘের বিরাট অনুষ্ঠানটি অশোকা হোটেলের মস্ত নাচঘরে হল। এই অনুষ্ঠানে বড় বড় সরকারী কর্মচারী, মস্ত মস্ত রাজনীতিবিদ্, বিদেশী দূতাবাসের লোকজন এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ধুরন্ধরেরা এসে মিলিত হয়েছিলেন। আমি এই দলে যোগ দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় নানারঙা পোশাক পরা দরোয়ান রাজপ্রাসাদের প্রহরীর ঘোষণার মত করে বলল, “রানীসাহেবা শ্রীমতী বিমলেন্দুমতী…”

জাঁকজমক ও সাজ-প্রসাধনের চটক ছড়িয়ে ওই ক্ষুদ্রাকৃতি মহিলাটি মৃদু পায়ে আসতে লাগলেন, সকলে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তাঁর চলার ধরন দেখেই বোঝা গেল যে উনি এই রকম বিরাট অভ্যর্থনাই আশা করেছিলেন।

চওড়া সোনালী পাড়ের গাঢ় লাল শাড়ি ওঁর পরনে। আঁটো জামা গায়ে। পুতুলের মত গোলগাল মুখের উপর তাঁর কালো চোখ-দুটি জ্বলজ্বল করছিল।

খসখসে নীল কমিউনিস্ট ইউনিফর্ম পরা একটি চীনা মেয়ে এগিয়ে গিয়ে রানীসাহেবার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাত-তালি দিল। ভারত ও চীনের মৈত্রীর প্রতীক এই দুই মহিলা সকলের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

শেঠ মোটু-মল তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন, “আমরা মিস লীকে

অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তিনি চীনা সৌন্দর্য, মাধুর্য ও শুভেচ্ছার প্রতিনিধি।" চারদিকে প্রবল করতালি চলল, তারপর মোটু-মল আবার বললেন, "আমরা ভারতের মৈত্রীর প্রতিনিধিরূপে অভ্যর্থনা করছি দিল্লীর এই সম্রাজ্ঞীকে। শ্রীমতী বিমলাকে।"

রানীসাহেবা এগিয়ে এসে বললেন, "যথেষ্ট বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। এখানে তুমি পার্লামেন্টের বক্তৃতা দিচ্ছ না। ওই আমার স্বামী আসছেন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলি। তুমি মিস লীর সঙ্গে কথা বল।"

কিন্তু তাঁর স্বামী বিষম খাটুনিতে যেন ক্লান্ত এই রকম মনে হল। নানারকম সরকারী কাজের ভারে তিনি যেন ভারাক্রান্ত। স্বামীর অন্যমনস্কতা ভাঙবার জন্যে রানীসাহেবা তাঁর হাত ছুঁলেন, "কাল সকালে আবার তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে তুমি নিশ্চয় দুঃখিত। আমার যদি সেখানে অত কাজের চাপ না থাকত তাহলে সত্যিই মুসৌরী যেতাম না। বার বার আমাকে যে পাহাড়ী অঞ্চলের সৌন্দর্যের রানী সবাই বলছে, তার জন্যে তুমি কি গর্বিত নও? এই বছর আমি নিশ্চয়ই হিমালয়ের সৌন্দর্যরানী বলে অভিনন্দিত হব। এতে তুমি কতটা গৌরবান্বিত হবে, তাই না?"

হয়তো কথা থামত না, কিন্তু মিস লী তার হাতে চাপ দিল বুঝি এইজন্যে যে, সে যেন তার স্বামীকে কথা বলার একটু সুযোগ দেয়।

স্বামীটি সরকারী দায়িত্বের বড় বড় প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, "আমার জীবনে আমি কখনো আকাশসীমা লঙ্ঘনের কথা শুনিনি।"

"কে আবার এ নিয়ে ঝগড়া শুরু করল?"

"চীনাদের বিমান হিমালয় পার হয়ে আমাদের ভূমির উপর অনেকবার উড়েছে। আমরা আপত্তি করিনি। এখন তারা একটা প্রতিবাদ দাখিল করেছে, বলছে যে, আমাদের একটা বিমান নাকি কাল সকালে গারটকের কাছে আকাশসীমা পার হয়ে চীনের তিব্বতী এলাকায় গিয়েছে।"

"তা হতে পারে না। কাল সকালে হবে কি করে। মোটু-মলের বিমান কাল আমাকে শ্রীনগরে নিয়ে যেতে পারেনি। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে ঘাটিতেই সেটা আটকে ছিল। বিকালে আকাশ সাফ হলে আমি একটা সার্ভিস বিমান নিয়ে তবে যাই।"

"আমিও খোঁজ করে দেখেছি আমাদের কোনো বিমান হিমালয়ের অঞ্চলেই যায়নি। কিন্তু তারা বলছে, বিমানটি গোয়েন্দাগিরি করতে তিব্বতে গিয়েছিল।"

"কোনো বিদেশী বিমান হতে পারে।"

"আমরাও খোঁজ করে দেখছি, কাজটা কোনো আমেরিকান বিমানের কিনা।"

"কিন্তু তা যদি হবে, তাহলে তারা বিমান চালায় কোন্ ঘাটি থেকে?"

রানীসাহেবার স্বামী মিস লীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "ভগবান জানেন। যা-ই হোক, আমি অফিসে চললাম।"

রানীসাহেবা বললেন, "তুমি কি এখন কাজ একটু বন্ধ রাখতে পার না?"

তিনি বললেন, "না।"

"কী দুঃখের কথা। কিন্তু আসছে-সপ্তাহে আমি তোমাকে মুসৌরীতে আশা করব। আমাকে তারা হিমালয়ের সৌন্দর্যরানী বলে নির্বাচন করলে কত খুশীই তুমি হবে।"

মিস লী আড়ালে ডেকে নিল রানীসাহেবার স্বামীকে, মোটু-মলও ইশারায় কাছে গেল। চাপা গলাতেই তারা বলতে লাগল নানা কথা—ইস্পাত কেমিক্যাল মেশিনারী ডিনামাইট চীনা ডলার ফরেন-এক্সচেঞ্জ, এবং প্রয়োজনীয় রপ্তানী লাইসেন্সের কথা।

এক কোণে কয়েকজন একত্র হয়ে দিল্লী থেকে তিব্বতী মেয়েটির অন্তর্ধানের গুজব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

রানীসাহেবার বুঝি ও-মত নয়, তিনি বললেন, "আমি ক্লান্ত।"

তারপর মোটু-মলকে বললেন, "দিল্লীর গরমে আমি আমার চামড়া ঝলসাতে রাজি না। তোমার প্লেন তৈরি রাখতে বল। কালই মুসৌরী পৌঁছতে চাই।"

তারপর তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে দরজার দিকে এগুলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমি কক-পিটে লুকিয়ে রইলাম। অবশেষে নামলাম এসে সাহারানপুরে।

রানীসাহেবার গাড়ি বিমানঘাটি ছেড়ে গেলে আমি বেরিয়ে এলাম মুক্ত বাতাসে।

মুসৌরীর পথে মোটরে যাবার সময়েও আমি আমার মনের বিরক্তি ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। পাহাড়ী বাতাসে যদি মনের অবস্থা ভালো হয়, মনে মনে শুধু এই আশা করতে লাগলাম।

৬। তিব্বত এখনও হারায়নি

চীনা কমিউনিস্ট আক্রমণকারীদের কাঁটাওলা বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে তিব্বতের মানুষেরা কাতরভাবে আর্তনাদ করেছে। তাদের হাড় সত্যিসত্যি ভেঙে চুরমার হয়েছে। কিন্তু হিমালয়ের ওই উচ্চ প্রাচীর পার হয়ে তাদের সেই হাহাকার বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছয়নি। উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে রক্তাপ্লুত সেই মানুষদের আর্তস্বর যেটুকু দিল্লী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাও হারিয়ে গিয়েছে অশোকা হোটেলের চকচকে নাচঘরের হট্টগোলে—যেখানে মিস লী ও রানীসাহেবা বিমলার মত সুন্দরীরা এসে জমায়েত।

মিস লীর তর্জনীর নখের একটা বিশেষত্ব আছে, যেমন ছুঁচলো তেমনি রক্তলাল রঙে রঞ্জিত করা। টাইপ-রাইটারে বা ড্রয়িংরুমে

ওই নখের সামান্য নর্তনে অনেকের অনেক-কিছু গোলমাল হয়ে যায়। তিব্বতের খাম্বা যোদ্ধাদের মর্মন্তুদ হাহাকারও কানে যায় না।

তিব্বতের স্বাধীনতা-যোদ্ধারা ভারতের হিমাচলের সীমা পর্যন্ত চীনাদের যোগাযোগের রাস্তা অনেকবার ভেঙে দিয়েছে। একেই ওই রাস্তা সংকটসংকুল, তার উপর এই ব্যাপারে ওই হাজার হাজার মাইল পথ পার হয়ে চীনারা রসদ সরবরাহ করতে বেগ পায়। এইজন্যে যে-সব চীনা সৈনিক হিমালয়-প্রান্তের তুষার-রাজ্যে নিযুক্ত ছিল তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সীমান্তের এই সংকট মোচনের জন্যে মিস লী তখন দিল্লীতে তার ওই রঞ্জিত তর্জনীর কারসাজি করে চলেছে—যে-সব জিনিস কখনো পিকিঙেও মেলে না, ওই তুষার-রাজ্যে চীনা সেনারা যাতে সে-সব পেয়ে যায়।

বাইরের লোকে সব না জেনে বলতে লাগল যে ভারতই এই ড্রাগনদের নিজের ঘরের দরজায় ডেকে এনেছে, এবং তাকে দুধ-ঘী খাইয়ে লালন করছে। তিব্বত সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেল, তা চীনা সূত্র থেকেই। অতএব জানা গেল যে তিব্বতীদের মুক্তিদানের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে এবং অচিরেই তা সমাপ্ত হবে। আর আমাদের দেশে প্রচারিত হল, ওই ড্রাগন আমাদের মিত্রতার ফলেই এসেছে, তারা পঞ্চশীল মেনেছে, এবং ভারতের গায়ে দাঁত বসাবে না বলে শপথ করেছে। সুতরাং, তিব্বতে কোনো গোলমাল নেই, সব শান্ত।

মুসৌরীতে আমাদের কুটিরে পৌঁছে আমরা তুষারশুভ্র শৃঙ্গগুলির দিকে তাকালাম। মনে হল, ড্রাগনের নিশ্বাস-বাষ্পে তারা আচ্ছন্ন, এবং ওই জীবটি যেন ধীরে ধীরে তার হাঁ বড় করছে।

সাংগে রিমপোচে ও পেমা সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভোগ করছে। কোন্‌টা সুখ কোন্‌টা দুঃখ সে বোধ যেন নেই। জীবনটা গড়িয়ে যাচ্ছে, যাক,—এই যেন মনোভাব। এর চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তারা অভ্যস্ত বলে মুসৌরীর শীতে তারা কাবু নয়। কয়েকজন

চৌকিদার ও দোকানদার লামার উপর দয়াপরবশ, এইজন্যে লামা তাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে তারা কিছু দেয়। এতেই দুটি মানুষের জীবন বেশ নির্বাহ হচ্ছে। ভাগ্যের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা তাদের নেই।

তিব্বতের উপরে আমার উড়ে যাওয়ার ঘটনাটা তাদের বলতে গেলাম, তখন তারা খুঁটিনাটি জানার জন্যে ভীষণ ব্যগ্র হল। লামা বললেন, "তুমি এখানে দেখছ আমার দেহটাই। আমার অন্তরাত্মা পড়ে আছে তিব্বতে। তোমার তিব্বতের উপর উড়ে যাওয়ার কথা শুনে আমার দেহও যেন সেই উদ্‌ভ্রান্ত আত্মার সঙ্গে যুক্ত হল।"

লামার দৃষ্টি চলে গেছে দূর-তিব্বতে, যেন ফিরে আসছে না। তাঁর মন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তিব্বতে পৌঁছে গিয়েছে, "আমার দেশের কাউকে তুমি দেখেছ ?"

"অত উঁচু থেকে কোনো মানুষকে দেখতে পাইনি। আমরা নীচু দিয়েও উড়িনি, নামিওনি—ও-সব করলে চীনারা আমাদের গুলি করত।"

পেমা বলল, "কিন্তু তোমাকে দেখলে তিব্বতীরা উল্লসিত হত।"

"তাদের মধ্যে যাওয়ার আগ্রহ আমাদের ছিল, এমনকি তাদের রান্নাঘরে বসে এক বাটি চা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও জেগেছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল পেমা, বলল, "অনেক ঘরবাড়ি এখন আর নেই। চীনারা বলে তিব্বতের অনেকটা এলাকা তারা মুক্ত করেছে, তাই সে-সব জায়গায় আর কোনো তিব্বতীর চিহ্ন নেই।"

এ-কথা শুনে যেন বিরক্ত হলেন লামা, তিনি বললেন, "না হে না, চীনাদের কথা ঠিক না। বেশির ভাগ তিব্বতী যাযাবর-জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তারা অনেক উঁচু মালভূমির ঝড় ও শীত গ্রাহ্য না করে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে দিন কাটাতে পারে। প্রকৃতি অনেকটা সৎ-মার মত ব্যবহার করে নানা দুর্যোগ ও দুর্ভোগ সৃষ্টি করে থাকে, আর সেই দুর্যোগে তিব্বতীরা সারাটা জীবন অনায়াসে কাটাতে পারে। এমন যে

কষ্টসহিষ্ণু জাত, তাকে নিশ্চিহ্ন করে এমন সাধ্য চীনাদের নেই। কমিউনিস্ট চীন যতই কঠোর হোক ও যতই অমানুষিক ব্যবহার করুক না কেন, তারা কিছুতেই তাদের কাজ হাঁসিল করতে পারবে না, কেননা তিব্বতীদের পিছনে হাজার হাজার বছরের দুঃসাহসী জীবনযাপনের ট্র্যাডিশন আছে। তিব্বতকে বাঁচতে হবে, তিব্বত বাঁচবে।”

আমাদের দৃষ্টি পুনরায় উত্তরের ওই শিখরমালার উপর নিবদ্ধ হল, ওই শিখরমালা আর যেন কোনো বাধা বলে বোধ হল না।

আমাদের তিনজনেরই মনে হল ওই মহান লামা-ভূমি যেন আমাদের অতি নিকটে।

দিল্লীর অশোকা হোটেলে আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি তাদের বললাম। ওই আতঙ্ককর খবরে তারা মুষড়ে পড়ল। তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের আশা যেন দূরে সরে গেল।

দূরের ওই শৃঙ্গগুলির থেকে লামা তাঁর চোখ ফেরাননি। ওদের কাছ থেকে টাটকা প্রেরণা পেয়েই যেন লামা বললেন, “আমাদের তিব্বতী বৈশিষ্ট্য আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টিকে থাকার শক্তি। সুতরাং, অবস্থা যতই শোচনীয় মনে হোক-না কেন, আমাদের জয়ী হতেই হবে।”

পেমা প্রস্তাব করল যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্ল্যান করার আগে তিনজনে মিলে খানিকটা হেঁটে আসা যাক। তদনুযায়ী আমরা বেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরেই দেখা হল ক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে—গোমতী-প্রপাতের কাছে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ক্র্যাফ্‌ট বললেন, “তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে আমি চেষ্টা করছিলাম। আজ আমাদের দেশের খবরের কাগজের অনেকগুলি কাটিং পেয়েছি, তাতে দেখছি একটা দরকারী খবরকে তারা বেশ বড়

হরফে ছেপেছে : ভারতের হিমালয় পর্বতমালার ওই পারে চীনারা বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছে। তাদের মতিগতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, তারা ভারত-ভূখণ্ডে ঢুকবে। আমি এখানে হিমালয়ের অভ্যন্তরে আছি বলে আমার দেশের খবরের কাগজ এ সম্বন্ধে পাকা সংবাদ চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেমন আশ্চর্য লাগছে, ভারতের খবরের কাগজ এ সম্বন্ধে যেন নীরব। উপরন্তু চীন-ভারত মৈত্রী নিয়েই তারা এতদিন ব্যস্ত ছিল। আমরা যে অঞ্চলে আছি, সেই অঞ্চলেই এ-কাণ্ড ঘটেছে অথচ আমরা এ-খবর যেন জানিই নে। যা-ই হোক, চীনাদের এই অভিযানের পরিণতি খুবই ভয়াবহ।"

"কি হতে পারে বলে তুমি মনে কর ?"

ক্র্যাফ্‌ট বললেন, "ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধ তীব্র এবং দেশের প্রতি অনুরাগও প্রবল। এই ব্যাপারের তাৎপর্য ভালোভাবে বুঝতে পারা মাত্র ভারতবাসীরা তাদের দেশের সীমা থেকে চীনা আক্রমণকারীদের তিব্বত পার করে বিতাড়িত করবে। কেননা, চীনাদের খানিকটা দূরে না সরালে নিজের দেশের নিরাপত্তা ঠিক থাকে না। হ্যাঁ, তোমার দেশ এ কাজ করতে পারে, সে সাধ্য তার আছে। এইসব পরিবর্তন যখন ঘটবে, তিব্বতও তখন তার হৃত স্বাধীনতা ফিরে পাবে।"

ক্র্যাফ্‌টকে সমর্থন করে লামা বললেন, "ওই একটা পন্থা বটে। আমাদের তিব্বতী গেরিলাবাহিনী এই রকম সুযোগেরই অপেক্ষায় আছে। ওই গেরিলাবাহিনী চীনাদের সুদীর্ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দিলে ভারতীয় সেনাদের পক্ষেও চীনাদের পর্যুদস্ত করা সহজ হবে। অসুরশক্তির উপর শুভশক্তির জয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।"

প্রার্থনার জন্যে সাংগে রিমপোচে কুটিরে ফিরলেন। আম্মুকে ও পেমাকে ক্র্যাফ্‌ট স্কেটিং-এ যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। সেখানে

পৌঁছতে অনেকটা পথ। হানা ও পেমা হাত ধরাধরি করে চলেছে, যেন দুটি স্কুলের ছাত্রী চড়াইভাতি করতে চলেছে।

বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে ক্র্যাফ্‌ট আগে আগে হেঁটে চলেছেন, "ভারত-ভূখণ্ডে চীনাদের হামলা ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতের বুদ্ধির উপর চ্যালেঞ্জস্বরূপ। মনে হচ্ছে, এই সংকটে ভারত যেন ইতিহাসের পাতায় সম্মানিতভাবে একটি অধ্যায় লাভ করবে। যে দেশ অন্য দেশকে পদানত করতে চায় তার নিস্তার নেই, তার পতন অনিবার্য। তিব্বতে চীনারা কেবল সে-দেশের লোককে পদানত করেনি, তারা মানবজাতির প্রতিও অন্যায় করেছে। এইজন্যে ভারতের উপর তিব্বতকে মুক্ত করার দায়িত্বই শুধু বর্তায়নি, ওই ড্রাগনের বিষাক্ত দাঁত ভেঙে দিয়ে জগতের ও মানবজাতির মধ্যে শান্তি আনয়ন করার দায়িত্ব পড়েছে ভারতের উপর।"

"তুমি কি মনে কর, তোমার মতের ওই ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে?"

"আমরা জার্মানরা এ-সব ব্যাপারে অস্ত্রশক্তির উপরেই বেশি নির্ভর করি। তার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে সশস্ত্র বাহিনীর কথা, শিল্প উৎপাদনের কথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা, দেশের লোকের মনোবলের কথা, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা। এই সবগুলি একত্রে 'বিবেচনা করলে চীনাদের অবস্থা সঙ্গিন বলে মনে হয়। 'হিমালয়ের যুদ্ধ' যদি এর এই আখ্যা দিই, তবে এই যুদ্ধে একজন ভারতীয় সেনার সমান হচ্ছে চীনাদের সাতজন যোদ্ধা। সারা পৃথিবীর লোক জানে, ভারতের যুদ্ধের উপকরণ খুবই উচ্চস্তরের। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ভারতীয় অফিসার ও সৈন্য উচ্চশ্রেণীর—যেমন সাহস, তেমনি শক্তি। ভালোভাবে শিক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা যেমন কুশলী তেমনি দক্ষ, তেমনি নিয়মানুবর্তী। এইজন্যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারতবর্ষ সহজেই হিমালয়ই শুধু রক্ষা করতে পারে এমন নয়,

তিব্বতকেও স্বাধীন করতে পারে, এবং চীনা সেনারা যদি হিমালয়ের তুষারেই জমে না মরে যায়, তাহলে যেখান থেকে তারা এসেছিল সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দিতেও পারে।”

বরফের উপর আমরা চমৎকার একটি সন্ধ্যা আনন্দে কাটালাম। স্কেটিং বেশ উপভোগ্যই হল। হানা যেন তার ভিয়েনার আত্মা ফিরে পেয়েছে। ক্রীড়াবিদ্ বলে সে খ্যাতও নয়, তেমন কুশলতাও তার নেই, কিন্তু তার শরীর চালনার মধ্যে বেশ মাধুর্য আছে।

স্কুলজীবনে পেমা দার্জিলিঙের জিমখানায় স্কেটিং অভ্যাস করেছিল। কিন্তু অভ্যাস না থাকায় সে বার কয়েক পড়ে গেল। হানা তাকে হাত ধরে তুলে বলল, “পতনকে ভয় কোরো না। আছাড় না খেলে কেউ হাঁটতে শেখে না। স্কেটিং-এও যেমন জীবনেও তেমনি—এ পরম সত্য।”

কিন্তু পেমা বলল, “আমার পা টনটন করছে। এই শাড়িতেও অনেক বাধা হচ্ছে।”

“তা হোক। তুমি যদি স্কেটিং-এ ওস্তাদ হতে, তাহলে আমি তোমাকে শেখাতাম কি, বলো!”

স্কেটিং-এ আমাদের এতটা অনুরাগ দেখে কীপার অনেকক্ষণ আমাদের খেলতে সময় দিল। আমরা একটানা স্কেট করলাম। সময়ের হিসাবই রইল না। যে-সব দর্শক ভিড় করেছিল, তারাও চলে গেছে। হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে এল, ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল।

পেমা বলল, “অনেক ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে দার্জিলিং স্কুলে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু তুমি তাদের থেকে আলাদা।”

বলে পেমা এই কথাগুলি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে হানাকে বলতে বলল।

হানা শুনে বলল, “ওকে বলো, আমি একজন খাঁটি ভিয়েনিজ।

যা-ই ঘটুক-না কেন, আমরা সব সময় হাসিখুশি থাকতে জানি। এতেই আমাদের জীবনের স্বাদ।"

ম্যালে পৌঁছনোর আগেই আমরা ভিজে নেয়ে গেলাম। ম্যালই হচ্ছে মুসৌরীর প্রধান রাস্তা। বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু দুন-এলাকা থেকে হিম হাওয়া আসছে। পেমা বলল যে, এ হাওয়া তিব্বত থেকে আসছে, কিন্তু হানা বলল অন্য কথা। মাঝখান থেকে ক্র্যাফ্‌ট বলল, "এটা হল ইস্ট-উইণ্ড। দেখছ না ওই আলো, আর আলোর নীচে যে মানুষরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের চালচলনে মনে হচ্ছে না—জায়গাটা বেশ উষ্ণ। এটা আমাদের বার্লিনের শরতের আবহাওয়া।"

আমরা চলেছি, এমন সময় দেখলাম খাড়াই-পথে একটা রিকশা উঠে আসছে। সাধারণ রিকশাওয়ালার গায়ে যেমন জামা থাকে, এর গায়ে তার চেয়ে অনেক বেশি, এবং বেশ চকচকে সেই সাজ। তাতেই বুঝতে পারলাম, এটা একটা প্রাইভেট রিকশা। কোনো স্টেটের কোনো বিত্তশালীর রিকশা হয়তো।

রিকশার আরোহিণী মোটা কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে চলেছেন, তার ফাঁক থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা বুঝি খারাপ আবহাওয়ার পাল্লায় পড়ে কাবু হয়েছ?"

সোনালী পাড়ের আড়ালে কানের হীরের দুলটির জাঁক দেখে চিনলাম, ইনি কে। ইনি রানীসাহেবা বিমলা।

তিনি আমাদের কাছে আসতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, "তোমরা বুঝি স্কেটিং চ্যাম্পিয়ানশিপে যোগ দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছ?"

হানা বলল, "তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা।"

"শোনো মিস ভিয়েনা। কিছু মনে কোরো না, তোমাকে ওই নামে সম্বোধন করলাম বলে। তোমার নামটা আমার মনে নেই। কিন্তু

তুমি এই নামেরই যোগ্য। আমাদের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় আমি বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে তোমার নাম দিয়েছি।"

"আমি ও-সম্মানের যোগ্য নই।"

"না, না। আমাদের নিরাশ করলে চলবে না।"

"কয়েক সপ্তাহ আগে এই প্রতিযোগিতা যেন হয়ে গিয়েছে?"

"না। তা কি করে হয়। কয়েকবার স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রথমত, আবহাওয়া খারাপ ছিল। তারপর চীনারা দিল্লীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কালকে অবশ্যই হবে। কাল সকালে মিস লী স্বয়ং এসে পৌঁছচ্ছে।"

"মাপ করবেন। মিস লী কে?"

"তাকে চেন না? দিল্লীতে যত দূতাবাস আছে, তাদের লোক-জনের মধ্যে এই মেয়েটিই সবচেয়ে অসামান্য। তার গুণপনা ও রূপের জন্যে সমস্ত দিল্লী প্রায় পাগল। চীনের মত দেশকে ভারতের এত ঘনিষ্ঠ করার মূলে আছে সে। কাল আমরা তাকে একটা বিশেষ পদক দিতে চাই, তাতে খোদাই করা থাকবে—'মিস-কে। পিকিঙের আন্তরিক শুভেচ্ছার জীবন্ত প্রতীক তুমি, ভারতের প্রতি চীনের এই বন্ধুত্বের মূলে তুমি।' অনেকের ধারণা চীন-ভারত মৈত্রী সংঘের মহিলা-শাখা বুঝি নিষ্কর্মা। তারা যদি জানত এশিয়ার এই মহান দুই দেশের মধ্যে সখ্য স্থাপনার কাজটা কত মেহনতের! এ-কাজে একটা জীবন লাগে। এই কনকনে শীতে এই রাত্রে কালকের অনুষ্ঠানের জন্যে আমাকে বেরতে হয়েছে। কিন্তু উপায় কি। কাজটা যে আমাদের একটা মস্ত জাতীয় কর্তব্য।"

হানা বলল, "কালকের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার কথা বলছ?"

"তোমরা চারজনে যদি কালকে হ্যাকম্যানের ওখানে না আস, আমি তাহলে আমার ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করব।"

ক্র্যাফ্‌ট বলল, "তোমাকে অপমান করব এমন দুঃসাহস আমাদের নেই।"

"তাহলে, মিস ভিয়েনা, তুমি বিচারক হতে রাজি হলে? আর, তোমরা চারজনেই অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছ। যদি না আস, আমি তোমাদের নামে এ-জায়গা থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করাব।" চতুর হাসি হেসে বললেন রানীসাহেবা।

শীতে আমাদের দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল, তা না হলে হয়তো কথা আরো চলত।

রানীসাহেবা বিমলা হানার দিকে চেয়ে রূঢ় হাসি হাসলেন, যেন ভয় দেখালেন, তারপর হীরের দুলটির উপর টেনে নিলেন শাড়ির পাড় —এইটেই হল রিকশাওয়ালাকে চলার নির্দেশ।

পেমা বুঝি ভয় পেয়েছে, "মনে হচ্ছে, যে ভয় দেখাল তা বুঝি ও সত্যিই করতে পারে।"

ঘৃণা প্রকাশের মত শব্দ করল হানা, যেদিকে রিকশাটা গেল, সেই-দিকে জিভ দেখিয়ে বলল, "শুয়োরের মত লম্বা নাকওয়ালী বুড়ি ডাইনী…"

পরদিন বিকেলে হ্যাকম্যানের ওখানে যাওয়ার জন্যে হানা আমাদের পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু পেমা যেতে কিছুতে রাজি নয়; সে বলল, "তার চেয়ে আমাদের ওই স্কেটিংই ভালো। যে ভিড়ের মধ্যে ওখানে যাব সে ভিড়ের সঙ্গে আমাদের মিল কোথায়? তারা এমনি সব বড়লোক-ঘেঁষা যে ওদের মধ্যে গেলে আমি অস্বস্তিবোধ করি। তার চেয়ে নরখাদকদের মধ্যে যাওয়া ভালো।"

"কিন্তু তোমার হয়েও রানীসাহেবাকে কথা দিয়েছি যে।"

"আমি না গেলে তাদের কিছু হবে না। আমাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছিল রানীসাহেবার তা মনেও নেই।"

"সে কিছু না মনে করুক, কিন্তু আমার যে ভালো লাগবে না। আমার খাতিরে চলো যাই।"

"সেখানে যেতে কেন জানিনে আমার বড় ভয় হচ্ছে। ওখানে চীনের লোক আসবে, দিল্লীর লোক আসবে। শাড়ি পরে গেলেও তারা বুঝবে যে আমি তিব্বতী। আমার মুখ দেখেই তারা কত ব্যঙ্গ করবে, কত অপমান করবে।"

"আমিও তাদের চিনি। আমার সামনে ও-রকম কিছু করতে তারা ভরসা পাবে না।"

অবশেষে একটা রফা হল। হানা ভার নিল যে সে আমাদের জন্যে অল্প-আলোকিত করিডরে সীট যোগাড় করে দেবে। ওখানে লুকিয়ে বসে থাকা যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি অসুবিধে বা অস্বস্তিবোধ হয়, পাশের দরজা দিয়ে সরে পড়া যাবে।

ক্র্যাফ্‌ট-দম্পতির দৃঢ় ধারণা যে আমাদের পক্ষে কোনো রকম অস্বস্তিকর অবস্থা সেখানে কিছুতে হতে পারে না।

আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, উৎসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। যদি শাড়ি-পরা মহিলারা না থাকতেন এবং ওই জনতার মধ্যে কালো ও হলুদ রঙের মানুষরা না থাকত তাহলে অনেকেরই মনে হত লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলে চীন-ভারত ফ্যান্সী নাচের আয়োজন হয়েছে বুঝি।

মস্ত হলের কেন্দ্রে চমৎকার নাচের চক্র তৈরি হয়েছে। মহিলারা চীনা সিল্কের শাড়িতে বা জর্জেটে সেজে, এবং পুরুষরা সাঁঝের পোশাক পরে পাক খেয়ে পাক খেয়ে নাচছে। দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্যে অর্কেস্ট্রা আনানো হয়েছে ; তাঁর সুরের সঙ্গে সঙ্গে সকলে যেন সমান তালে নাচতে পারে, তা দেখার জন্যে স্যাভয়-হোটেলের বলডান্স টিচার এসেছেন। আমেরিকায় যে নাচটি এখন খুব চালু, একজন ইঙ্গ-চীন মেয়ে সাপের মত করে নিজের শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সেই নাচ নাচছে, আর অন্যান্য সকলে তার দেখাদেখি সেইভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে।

অর্কেস্ট্রার বিপরীত দিকে বাছাই-করা সুন্দরীরা আসন নিয়েছেন।

ছুটি বিশেষ লাল-মখমলে মোড়া ছুটি আসনে বসেছেন কমিউনিস্ট ইউনিফর্ম পরা মিস লী, আর দামী সোনালী বুটি দেওয়া শাড়ি পরা রানীসাহেবা। অন্যান্য চীনা ও ভারতীয় সুন্দরী পিছনে বসে। শাড়ির খসখস শব্দের সঙ্গে চলেছে কারো শ্যাম্পেন-পান, কারো-বা লেবুর রস পান। এবং সেই সঙ্গে খলখল হাসি।

পুরনো আর নড়বড়ে চেয়ারে বসে আমরা সামনের সীটে বসা গুণীজনের আলোচনা শুনছিলাম, সে আলোচনা অনেকটা ধারা-বিবরণীর মত।

একজন বেশ উত্তেজিত গলায় বলল, "জান না, ওই ভিয়েনী মেয়েটা সব ওলটপালট করে দিয়েছে।"

"কি রকম ?"

"কে কোন মেডাল পাবে, আগে থেকেই তা দিল্লীতেই ঠিক হয়ে যায়। এখানকার এ-অনুষ্ঠান অনেকটা লোক-দেখানো, কেবল ঘোষণা করা যে, রানীসাহেবা ও মিস লী প্রাইজ পেল। ওদের দু'জনের রকম-সকম দেখে বুঝতে পারছ না ? কেমন অহংকার নিয়ে ওরা বসে আছে। শুনলাম পিকিং ও বম্বের সিনেমা-জগৎ থেকে বিউটি-এক্সপার্টদের এখানে আনা হয়েছ ওদের সাজ ঠিক করে দেওয়ার জন্যে। এরকম অবস্থায় ওরা যদি প্রাইজ না পায়, তাহলে দিল্লীতে বোমা পড়ার চেয়েও সেটা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।"

"দিল্লীর সিদ্ধান্ত বদল হল কি জন্যে ?"

"ভিয়েনী মেয়েটা বলছে—যোগ্যতার বিচার না করে কেবল তোষামোদের জন্যে প্রাইজ দেওয়াটা সৌন্দর্যের প্রতি অসম্মান। মেয়েটা শক্-ট্রিটমেন্টের পক্ষপাতী—অর্থাৎ কিনা আচমকা ঘা দিয়ে চাঙ্গা করাই ওর বুঝি ইচ্ছে। এইজন্যে বিচারকরা যখন লোক-দেখানো একটা গোপন পরামর্শের জন্যে ভিতরে গেলেন, তখন মেয়েটা ওই দুই পূর্ব-নির্বাচিত সুন্দরীদের সম্বন্ধে মারাত্মক মন্তব্য করে। সে বলে,

মিস লীর দাঁত উঁচু, তার থেকেই বোঝা যায়, তার শিরায় তিব্বতী রক্ত প্রবাহিত।"

"আর রানীসাহেবা সম্বন্ধে ?"

"সে বুঝি আরো মারাত্মক। তার সম্বন্ধে বলেছে যে, রানীসাহেবা যদি গরিব ভারতীয় মেয়েদের শরীর থেকে মেদ চুরি করে নিজের শরীরে মজুত না করত, তাহলে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার যোগ্য বলে তাকে স্বীকার করতাম। তা ছাড়া, সে নির্লজ্জভাবে তার অঙ্গ জাহির করে। সমাজ ও ঐশ্বর্য দিয়ে যা পাওয়া সম্ভব সবই তার আছে, এখন প্রকৃতির কাছ থেকে যা পাওয়ার কথা, সেই সৌন্দর্যও সে চেয়ে বসেছে।"

"কিন্তু ভিয়েনী মেয়েটাই একমাত্র বিচারক তো নয়!"

"অন্যদের উপর সে টেক্কা দিয়েছে। স্যাভয় হোটেলের মালিক হচ্ছেন একজন বিচারক। তাঁর স্ত্রী সব সময় মনে করেন যে, রানী-সাহেবা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব তাঁর স্ত্রী যখন পাচ্ছেন না, তখন তাঁর মতটাও ওই মেয়েটার দিকেই যাবে। এমন মেয়েই তাঁরা খুঁজছেন যে রং মেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বনাশ করে না।"

"যা-ই হোক, এ ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে, যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় ওই দুই মেয়েকে জয়ী করার জন্যে টাকা খরচ করেছেন, সেই রাজনৈতিক মহলে এর দ্বারা একটা ভূমিকম্পই হবে মনে হচ্ছে। চীন-ভারত মৈত্রীর এই দুর্দশা সহ্য করা অসম্ভবই তাঁদের পক্ষে।"

পাউডার অডিকলন সেণ্ট ও শ্যাম্পেনের গন্ধে ঘরটি আচ্ছন্ন।

পেমা আমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, "এখন কি আমরা যাব ?"

"কেন যাব ?"

"তুমি হয়তো ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পারনি।"

"তারা আমাদের কি করতে পারে ?"

"আমাদের গিলে ফেলতে পারে।"

যে-সব ওয়েটারের এখন ডিউটি নেই—তারা, এবং অনেকগুলি মেয়ে দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ভিতরের তামাশা দেখছিল। আমরাও তাদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে দেখছিলাম।

দুই দেশের দুইটি পরীকে মুকুটভূষিত করার জন্যে সকলে তৈরি। চমৎকার সাজে সজ্জিত দুইজন পুরুষ চকচকে মুকুট-দুটির কাছে দাঁড়িয়ে —ওদের দু'জনের মাথায় তা পরিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত; আর ওদের মুখ তখন প্রসন্ন হাসি মাখা। এবং পদাধিকার অনুযায়ী একদল হোমরাচোমরা মানুষ ওদের গলায় বিজয়মাল্য দেওয়ার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। সকলের দৃষ্টিই মিস লী ও রানীসাহেবার দিকে নিবদ্ধ।

নাচের আওয়াজ থেমেছে, অমনি স্যাভয় হোটেলের মালিক মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "এখন আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করব। আমাদের মতে সবচেয়ে সুন্দরী হিমালয়রানী হচ্ছেন—"

তিনি দম নেওয়ার জন্যে থামলেন। যারা মুকুট ও মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ওই দু'জনের দিকে একটু এগুল, তখন মাইকে বেজে উঠল ঘোষণা "অজ্ঞাত তিব্বতী মেয়ে পেমা।"

কামানের গোলা এসে পড়লেও কেউ এতটা চমকাত না।

সামান্য স্তব্ধতার পর চারদিকে হট্টগোল আরম্ভ হল। চীন ও ভারতের দুই প্রতীকের দিকে না তাকিয়ে সকলে খুঁজতে লাগল সেই অজ্ঞাত মেয়েটিকে। কিন্তু হলে সে নেই। হঠাৎ বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা, সেই শব্দে মানুষের সমবেত গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

এই গোলমালে আমাদের সামনে থেকে ভিড় সরে গেল। হানা এসে আমাদের টেনে নিয়ে এল বাইরে। সেখানে দেখি, লী ও রানীসাহেবা হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে অভিসম্পাত করছে, বলছে, "এ নিশ্চয় কারো চক্রান্ত। চীন-ভারত মৈত্রীকে ভরাডুবি করার জন্যে কোনো বিদেশী শক্তির নিশ্চয় ষড়যন্ত্র।"

আমরা অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছি এমন সময় পাহারাওয়ালা আমাদের কুটিরের দরজায় এসে হাজির, বলল, "পেমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে দিল্লী থেকে একজন পুলিস-অফিসার এসেছেন। তিনি চড়াই পথ ধরে উঠে আসছেন। এখানকার একটি দূতাবাসের একজন লোককে বিষ খাইয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে তার নামে। ওরা বলছে, ধরা পড়লে ওর ফাঁসি নির্ঘাৎ। আমি তাদের ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছি। রাস্তাটা যদিও খুব খারাপ, তোমরা তবুও সেই ভিনসেণ্ট-হিল রাস্তাটা ধরে মুসৌরী থেকে পালাও।"

অন্ধকারের মধ্যে আমরা আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাইরের কুয়াশা জমে বড় বড় জলের ফোঁটা হয়ে আমাদের মুখে এসে লাগতে লাগল।

সূর্যোদয় আরম্ভ হয়েছে, আমরা তখন দিগন্তে লীন রাস্তার উপরে এসে পৌঁছেছি।

৭। গিরিশিরে দুর্ঘটনা

সমতল গ্রাম্যপথ ভেদ করে যেতে যেতে আমরা ভাবতে লাগলাম তিব্বতের ও হিমালয়ের উপর চীনারা কি রকম কৌশল খাটিয়ে চলেছে। আমাদেরই বা কি দশা হবে, এবং আমার তিব্বতী বন্ধুদের অদৃষ্টেই বা কি দুর্গতি আছে, সে কথা ভেবে পাওয়া কঠিন হল।

কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার ছিল—আমরা মানুষের অধিকার ছাড়ব না এবং চীনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ব। খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে, চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ খাম-গোলক মালভূমি এলাকায় গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে, সেখান থেকে চীনা হামলাদারদের তাড়াবার জন্যে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে।

চুয়েন চু হাউস
ইয়াটুং
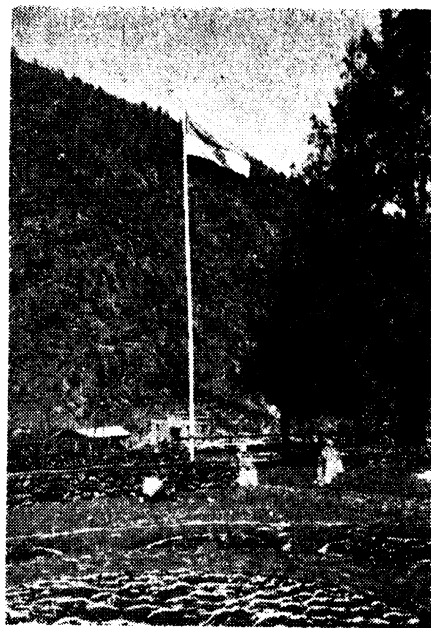
ভারত-তিব্বত বাণিজ্যপথে ১২০০০ ফুট উচ্চে তুষারময় হ্রদ

ক্যারগু গুম্ফা

গিরিপথের পুনরাধিকার

চীনাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সাংগে রিমপোচে বলতেন, "আমরা সন্ন্যাসী, মানুষকে নিধন করা আমাদের বারণ। কিন্তু চীনাদের অত্যাচারে আমরা আমাদের জীবনের সে শপথ পরিহার করতে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব। অনেকগুলি মঠের লামা তিব্বতী অশ্বারোহী গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে বাহিনী পরিচালনা করছেন লামাদের প্রধানেরা। আমরা রক্তপাত পছন্দ করি না, কিন্তু মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্যে চীনাদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হল।"

দিল্লীতে তাঁদের মিশন পণ্ড হওয়ায় ঘৃণার সঙ্গে হতাশাও মিশেছে। পেমা গলা ছেড়েই তার প্ল্যান করতে লাগল, "এখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে গ্রেপ্তার এড়ানো। চীনাদের মিথ্যা অভিযোগে আমার উপর কি রকম উৎপীড়ন করা হবে অনুমান করতে পারছি।"

রেল-লাইনের বরাবর রাস্তাটা গিয়েছে। একটা ট্রেন গেল। তার গায়ে গন্তব্যস্থল লেখা—লখনউ।

পেমা বলল, "চল, লখনউ যাই।"

"কি জন্যে?"

"শুনেছি সেখানকার তরমুজ ও সেখানকার গান সমান মিষ্টি। তাছাড়া, আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধু জিনত সেখানে আছে—রেডিয়োতে প্রায়ই তার গলা শুনি। তুমিও পাহাড়ী রেলপথ বরাবর তোমার বিমান-চালনার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পার।"

"চমৎকার আইডিয়া। এবার জিনতের কথা কিছু বলো তো। তাকে কখনো দেখিনি, কিন্তু তার গানের আমি খুব ভক্ত। সুন্দর গায়।"

"সংগীতভবনে আমরা একত্র ছিলাম। সে সগর্বে বলত—তার প্রপিতামহ নাকি অযোধ্যার শেষ নবাব—ওয়াজিদ-আলি শা।"

"লখনউর পুরনো বাসিন্দেরা তাঁর নামে গর্ব করে।"

"কিন্তু জিনতের আরো একটা বাড়তি গর্ব আছে। তার প্রপিতামহী ইতিহাসের স্মরণীয় মহিলা—বেগম হজরত মহল।"

"তার মানে যিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহিদের পরিচালনা করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তিনি। সেই শেষ নবাব এঁর সম্বন্ধে তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন। খুব গরিবের ঘরের মেয়ে ইনি। অসামান্য সুন্দরী ছিলেন, সে আমলের শাসকদের হারেমের জন্যে তাঁকে রাজার পেয়াদারা ক্রয় করে আনে। সেখানে তিনি ক্রমে উন্নীত হন মহলের পর্যায়ে। পদবী পান ইফ্‌ত্‌খার-উল-নিশা, অর্থাৎ নারীর গর্ব। অবশেষে, হারেমের ওই খেতাব নয়, ইতিহাস যেজন্যে তাঁকে মনে রেখেছে তা হল স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর নেত্রীত্ব। জিনত তার এই বিপ্লবী প্রপিতামহীকে নিয়ে ন্যায্যতই গর্বিত।"

"তারপর তাঁর জীবনে কি ঘটল ?"

"একজন স্বাধীন ও গর্বিত নারীর মেজাজ নিয়ে তিনি হিমালয়েরই কোথায় যেন নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। তাঁর জন্যেই আমার মনের মধ্যে লখনউ সৌন্দর্যের ও সংগ্রামের লীলাভূমিরূপে বিরাজ করে।"

লখনউ-এর উপকণ্ঠে আমরা একটা আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়ে চললাম। ওই আম-বাগানের মাঝখানে একটি ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন মন্দির বসানো।

সাংগে রিমপোচে বললেন, "এইসব হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের বিশ্রামের আস্তানা। আমি প্রার্থনা করব, আমাকে নামিয়ে দাও। তোমরা যখন যাবে, আমাকে তুলে নিয়ো।"

চারবাগ রেল-স্টেশনে আমি ও পেমা বিশ্রাম করতে গেলাম। কোনো হোটেলের চাইতে জায়গাটা অনেক আরামের।

গাড়ি থেকে মালপত্র আমরা নিয়ে আসছি, এমন সময় একটা ট্রেন এল। এর একটা কোচ এয়ারকণ্ডিশন্‌ড্, এবং দরজাগুলি রাইফেল-ধারী প্রহরী দিয়ে বন্ধ। তাদের দেখেই পেমা ভীত হল, বলল, "আমি ওয়েটিংরুমে ঢুকে দরজা দিই।"

খবরের কাগজের স্টলে কে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "লখনউতে তুমি কি করছ?"

চেয়ে দেখি সে আমার দিল্লীর বন্ধু, প্রকাশ্যে যে আমাকে তিব্বত-ব্যাপারে সমর্থন করেছে, যখন আর কারো কাছে কোনো সমর্থন পাইনি। সে বলল, "তোমার নামে অনেক গুজব রটেছে।"

"আমার কানে তো কিছু আসেনি।"

"কতকগুলি বন্ধু বাজি রেখে বলছে, তুমি লামা সেজে তিব্বতে চলে গেছ।" সে হাসল, বলল, "অন্যরা বলছে, হিমালয়ে তুমি রোমান্স করে বেড়াচ্ছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কি মনে করে?"

"আমি? গ্র্যাণ্ড মোগলের সঙ্গে এসেছি, তাঁর পারিষদ হয়ে।"

ওই গ্র্যাণ্ড মোগল খেতাবটা আমরা দিল্লীর এক কর্তাব্যক্তিকে দিয়েছিলাম। তিনি যদিও খুব বড় পদে আছেন, কিন্তু মানুষটার নিজের একটা আলাদা জগৎ আছে। দেশের বড় বড় সমস্যাকে তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, এবং তা সমাধানের বেশ সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন। কেউ তাঁকে নিয়ে তামাশা করলেও তিনি তা বুঝতে ধরতে পারেন না। ধরতে তো পারেনই না, ভাবেন বুঝি তাঁর প্রশংসা করা হল। কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই, লোকটার মর্জির উপরে অনেক লোকের ভাগ্য নির্ভর করে।

ওই লোকটির প্রিয় উক্তিটি উচ্চারণ করে বললাম, "উনি কি মাস্-কন্‌ট্যাক্টের জন্যে ভ্রমণে বেরিয়েছেন?"

"এবার খুব বড় কাজের ভার তাঁর উপর পড়েছে। জান তো,

তাঁর সঙ্গী হয়ে সঙ্গে আসি কেবল ভাতা লাভের আশায়। তাঁকে এবার বোঝাই যে, বন্যাপীড়িত এলাকায় ও হিমালয়ে ঘুরে এলে তিনি ত্রাণকাজের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন, এবং ভারতে চীনা হামলার বিষয়েও জানতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে এক মিনিট দেখা কর-না, তাহলে তোমার এই খাটনির মধ্যেও একটু মজা পাবে।"

আমার হাত ধরে টেনে সে সেলুনের কাছে নিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল, বলল, "ওহো, গ্র্যাণ্ড মোগল এখনো টয়লেট করছেন। ফ্রান্স থেকে আনা গোলাপ-গন্ধের ক্রীম তিনি প্রায় ঘণ্টা-দুই ঘষে মুখের ভাঁজ ঢাকা দেন। এ সময় কেউ যেতে পারে না, এমনকি তাঁর সেক্রেটারিও কালেভদ্রে এ অনুমতি পায়। আজ সে আছে। গ্র্যাণ্ড মোগল তো যা-তা লোক না, জনতার মানুষ। সময় নষ্ট করতে তাই পারেন না ; উঁকি দিয়ে দেখ।"

মনে হল একটা শিম্পাঞ্জি যেন মুখে রং মাখছে। সেণ্টের গন্ধেও বমি আসে। গ্র্যাণ্ড মোগলের অনেক আজগুবি কাণ্ডের কথা শুনেছি, কিন্তু আজ প্রথম তাঁর সাজঘর দেখলাম।

গ্র্যাণ্ড মোগল বলছেন, "কি কি ! খবরের কাগজে আমার লখনউ আসার কথা ছাপেনি ?"

হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর সেক্রেটারি বলল, "সার, প্রথমে প্ল্যান ছিল দিল্লী থেকে আপনাকে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে আপনি স্বচক্ষে প্লাবিত এলাকা দেখতে পান। এবং সেই সঙ্গে হিমালয়ের সমস্যাও। কিন্তু সার, 'আবহাওয়া খারাপের জন্যে প্লেন উড়ছে না, এইজন্যে আপনাকে বাধ্য হয়ে ট্রেনের ধকলের মধ্যে আনতে হয়েছে।"

"তোমাকে বরখাস্ত করব। টুর প্ল্যান কিভাবে করতে হয় জান না। তোমরা এক-একটা বেকুব মূর্খ।"

"হ্যাঁ সার।"

"বুঝতে পার না দরকারের সময় আমাদের না পেলে জনসাধারণের মনে কেমন ঘা লাগে ?"

"হ্যাঁ সার।"

"খবরের কাগজ আমার সম্বন্ধে কিছু ছাপে না কেন ? জনসাধারণের জন্যে আমার কাজের কি কোনো দাম নেই ?"

"না সার। আপনার কাজের মূল্য সকলের চেয়ে বেশি।"

"আমার প্রথম প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলে কবে নেমে যেত এই বন্যার জল। যাক, পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের হিমালয়ের উপর তিব্বতী হানার বিষয় কথা বলব, সাংবাদিক-সভা ডাক।"

"ডেকেছি সার। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মারফত।"

"তোমরা কোনো কাজের না। লখনউ-এর জ্যোতিষী কোথায়, আমার ভাগ্য বিচার করবে না সে ?"

"জ্যোতিষী চন্দুলরাম নাকি টাকা পায়নি বলছে।"

"সে কি কথা ! মোটু-মল নিশ্চয় দিয়েছে। তিব্বতে তার ব্যবসা সম্বন্ধে যাবতীয় পারমিট আমি পাইয়ে দিয়েছি। আর, নতুন শেরোয়ানির কি হল ?"

"সেটা দিল্লীতে গিয়েছে, সার।"

"ফটোগ্রাফাররা ?"

"তারা ট্রেনেই আমাদের সঙ্গে আছে।"

তারপর তিনি ছোটা-হাজরির জন্যে হাঁক দিলেন খানসামাকে।

গ্র্যাণ্ড মোগল নববেশে যখন এদিকে রওনা হলেন, অমনি আমি সেলুন থেকে নেমে পড়লাম। আমার বন্ধুটি মন্তব্য করল, "যে-সব কর্তাব্যক্তি আমাদের দেশের সমস্যার সমাধান করবেন তাঁদের মধ্যে এই গ্র্যাণ্ড মোগল মজার মানুষ না ?"

বন্যায় যাদের গ্রাম ভেসে গিয়েছে এমনি কতকগুলি কিষাণ ভিক্ষার

জন্যে প্লাটফরমে এসে ঢুকেছে। রাইফেলধারী পুলিসের সম্মুখে তারা সসম্ভ্রমে দাঁড়াল।

কিষাণরা তাদের অভাবের কথা বলার জন্যে তৈরি হয়েছে এমন সময় ট্রেন ছেড়ে গেল।

আমার মনের অবস্থা খারাপ হলেই একা একা বিমানে একটু ঘুরে এলেই মন প্রফুল্ল হয়। এবারও আমি ওই দাওয়াইয়ের চেষ্টায় আছি। পেমাও সঙ্গে যেতে চাইল।

বিমান-বন্দরের ফ্লাইং-ক্লাবে গেলাম। তাদের ট্রেনিং-এর পর লাইসেন্স পেয়েছি, এইজন্যে তারা আমাকে চেনে। আমি যখনই একটু ওড়ার জন্যে বিমান চেয়েছি, তারা দিয়েছে।

এবারও, আমি গিয়ে পৌঁছবার আগেই তারা দিনের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে, কিন্তু আমি যেতেই আমাকে একটা পাইপার বিমান দিতে চেয়ে বলল, "চমৎকার ওড়ে এটা। কিন্তু কসরত দেখানোর উপযুক্ত নয়। এটা নিয়ে উড়তে পার। ফিরে এসে হ্যাঙারের মধ্যে রেখে দিয়ো। লগ-বুকে সই কাল করা যাবে।"

পেমা বসল ইন্‌স্ট্রাক্টরের সীটে, আমি বসলাম শিক্ষার্থীরটায়। আমরা অচিরেই আকাশে উঠলাম। পেমার এ প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই উল্লাসে সে যেন অধীর। বলল, "জানতাম না এতে এত আনন্দ, এতে এত রোমাঞ্চ।"

উপর থেকে লখনউ অন্য রকম দেখাল। গোমতী নদী সবুজ মাঠকে যেন ধরে আছে, নবাব-প্রাসাদ আকাশে অঙ্গুলি-সংকেত করছে। আমিনাবাদ পার্কের জনতা ও হজরতগঞ্জ রাস্তার লোকে আমাদের দিকে হাত তুলে সানন্দে হাসছে।

অত্যন্ত আনন্দে পেমা বলল, "আমরা তিব্বতে যাই চল। সমস্ত লোক তাহলে বেরিয়ে এসে আমাদের রুটি দেবে, মাখন দেবে। গুম্ফা

থেকে বেরিয়ে লামারা উত্তরীয় ছুঁড়ে দেবে। আমরা উড়ন্ত প্রার্থনা-পতাকারও অনেক ঊর্ধ্বে থাকব, যেন স্বর্গের কাছাকাছি। চল, সোজা সেখানে যাই।"

"হিমালয়ের এলোমেলো বাতাস বড় খামখেয়ালী। ধর, সে বাতাসও পার হলাম? কিন্তু চীনারা? তারা আমাদের গুলি করে নামাবে।"

"তাহলে আগে তাদের তাড়াতে হবে তিব্বত থেকে, তারপর আমরা যাব।"

"আমরা যদি রোজ মুসৌরী-মানস সরোবর আর লখনউ-লাসা উড়ে বেড়াই, কেমন হয়?"

"তাহলে সে হয় জীবনের নিখাদ আশীর্বাদ। কিন্তু তা আমার কল্পনার বাইরে।"

"অমন উড়তে পারলে অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। ধার্মিকেরা সহজেই বড় বড় মন্দিরে ও গুম্ফায় পৌঁছতে পারবেন। খেলোয়াড়েরা, প্রকৃতিপ্রিয়রা, ভূতাত্ত্বিকেরা, বিজ্ঞানীরা নিজেদের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।"

পেমা বলল, "অ[illegible]র মানুষের চরম আনন্দ আসবে তার হাতের মুঠোয়।"

আমরা কয়েকটা পাক খেলাম। আর যতবারই বিমান নামাবার জন্যে তৈরি হলাম, ততবারই পেমা বলল, "না, না। আর এক পাক ঘোরো, আর এক পাক ঘোরো।"

"চুপ চুপ।" আমি চমকে উঠলাম, দেখি তেল আর নেই; বিমানের ইঞ্জিন প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে।

এই ভয়ংকর অবস্থার জন্যে নিজে দায়ী বুঝতে পেরে সে বলল, "এখন আমরা কি করব?"

"ঘাটি বেশি দূরে না। আমরা ভেসে নেমে যেতে পারব।"

সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেও বেগ দিয়েছে। এই জন্যে ভেসে নামাও কঠিন হল।

পেমা বলল, "দেখ, সামনেই এক-পাঁজা ইট, একটা পতাকা দণ্ড। হিমালয়ের গিরিপথের মত মনে হচ্ছে। নামতে পারব তো আমরা ?"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বিমানের চাকা ঠেকল একটি ঝোপে। ডান পাখা একটা খানায় ঘা খেল ও আটকে গেল। তার পর বিমানটা উলটে গিয়ে সশব্দে পড়ল। বিমানের একটা ভাঙা অংশ লাগল পেমার মাথায়।

আমার সীটের সঙ্গে কোমরে যে বেল্ট বাঁধা ছিল, এই ঝাঁকিতে সেটা ছিঁড়ে গেল, আমি বাইরে ছিটকে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে আগুন ধরেনি। ধুলো সরে যাওয়া মাত্র আমি ধ্বংসস্তূপ থেকে তাকেটেনে বের করলাম।

কাঁধে ফেলে তাকে নিয়ে গাড়িতে তুললাম। পেমা তখন সংজ্ঞাহীন।

সেই আম্রকুঞ্জটা কাছেই। এখানে সাংগে রিমপোচে প্রার্থনার জন্যে নেমেছেন। তাঁর সহায়তায় পেমাকে মাটিতে শোয়ালাম এবং তার কপালে ঠাণ্ডা জল দিলাম। আঘাত গুরুতর নয়। এটা একটা শক মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে সে চোখ খুলে ম্লান হেসে ধীরে ধীরে বলল, "আমি স্বর্গ থেকে ফিরে এলাম।"

লামা তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "এটা একটা খেলার অঙ্গ মাত্র। উঠে পড়, চল, এবার যাই।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "আবার কবে আকাশে উঠব ?" চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে উঠে বসল।

"সে পরে।" সাংগে রিমপোচে বললেন, "একটা দুর্ঘটনার পরে প্রথমে তীর্থে যেতে হয়। এখনি আমরা যাত্রা করব।"

সারারাত মোটর চালিয়ে ভোরে আমরা সারনাথে পৌঁছলাম।

চৌখম্বির চূড়ায় তখন সূর্যের স্বর্ণরশ্মি এসে লেগেছে। আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ ঠিক এই জায়গায় প্রথম উপদেশ দান করেন—বিধানচক্র সর্বদাই ঘোরে।

সারনাথে তিব্বতী তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। তারা যা স্বপ্নেও ভাবেনি তাই সত্য হয়েছে। দলাই লামা চীনা শৃঙ্খল ছিন্ন করে বুদ্ধের পবিত্রভূমির দিকে যাত্রা করেছেন, নিজের ও তাঁর দেশের মুক্তির জন্যে তাঁর এই অভিযান।

দলাই লামার স্বাক্ষর

তিব্বতী, সিংহলী, বর্মী, ভারতীয় লামা ভিক্ষু ও বুদ্ধের সাধারণ অনুগামীরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি ও কর্পূরদণ্ড নিয়ে ধামেক স্তূপের চারধারে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর, মূল পালীতে বুদ্ধের প্রথম উপদেশবাণী আবৃত্তি করছে, 'ইয়ম কিঞ্চি সমুদ্ধধম্মম সব্বম তম নিরোধধম্মম তি চ'—জগতে যা-কিছু সৃষ্টি হয়, তারই বিনাশ আছে।

আমাদের সাংগে রিমপোচের মতই লামারা তার তাৎপর্য বললেন—'ক্রীতদাস-রচনার জন্যে চীনাদের যত-রকম ব্যভিচার তার বিনাশ অনিবার্য।' এই কথাই একদিন বুদ্ধ বলেছেন, সমস্ত দেবতা বলেছেন। তরঙ্গসংকুল সাংপো নদী হেঁটে পার হচ্ছেন দলাই লামা। নদীর এপারে

পঞ্চাশ হাজার খাম্বা যোদ্ধা আছে, চীনারা এদের আটক করতে পারেনি। চীনা বিমান এদের সন্ধান করার চেষ্টায় রত। জগতে যে রাজ্য কেউ কখনো স্থাপন করতে পারেনি সেই মহৎ এক রাজ্য গঠনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন অবলোকিতেশ্বরের অংশ দলাই লামা।

দলাই লামার মঙ্গলের জন্যে সর্বত্র প্রার্থনা আরম্ভ হল—যাঁকে সকলে সর্বময় কর্তারূপেই নয়, মহামানবরূপে শ্রদ্ধা করে।

তিব্বতের একটি গুম্ফার একজন প্রধান মোহান্ত বললেন, "আমাদের কাছে এক পরমাশ্চর্য সুযোগ এসেছে। এবং সেই সঙ্গেই চীনাদের নৃশংসতার নেশাও চরমে উঠেছে। সবশেষ খবরে জানা গেছে, ভারত-চীন বাণিজ্যপথের প্রধান যোগসূত্র অনেক জায়গায় ছিন্ন হয়েছে। এরই দরুন দলাই লামাকে বাধা দেওয়ার জন্যে যে-সব চীনা সৈন্য নিযুক্ত হয়েছিল তারা আটক পড়ে গেছে। এখন, দলাই লামাকে সাংপোর দক্ষিণে বাঁক নিতে হবে, সে জায়গা সম্বন্ধে আমরা এখন উচ্চবাচ্য করব না। চীনাদের কাছে গোলমেলে খবর পৌঁছে দিতে হবে—যাতে তারা তাদের সেনাদের ভুল পথে পাঠায়। আমরা মস্ত সংবাদটি নিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করব যে, আমরা দলাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। ঠিক সেই পথ ধরে যাব, যে-পথ ধরে দলাই লামা আসছেন।"

সকলে এই কৌশল সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে ঠিক করল সেই দিনই তারা তিব্বত যাত্রা করবে।

আগে আগে সাংগে রিমপোচে, পিছনে আমি ও পেমা পবিত্র স্তূপের চারদিকে ঘুরলাম। লামা বললেন, "এ জায়গার পুরনো নাম ইশিপাত বা মৃগদাব। বুদ্ধ যখন এখানে আসেন তখন তিনি অনেক মুনিঋষির সাক্ষাৎ পান, তাঁদের সঙ্গে মৃগরাও রাত্রিযাপন করত—তার থেকেই ওই নাম। এই সেই জায়গাটি, এখানে বুদ্ধের প্রথম পদার্পণ মাত্র তাঁর প্রথম শিষ্য উঠে এসে তাঁকে প্রণাম জানায়। আর ষাট পা

উত্তরে গেলেই সেই স্থান যেখান থেকে বুদ্ধ তাঁর পরমসত্য মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বোধ হয়, এই জায়গা সেটা। আরো কয়েক ধাপ উত্তরে তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেন যে, পৃথিবীতে অত্যধিক রক্তপাতের পর তিনি বুদ্ধ মৈত্রের রূপে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে সশরীরে আবির্ভূত হবেন।"

লামা আরো বললেন, "আরো কিছুটা দক্ষিণে দৈত্য ইলাপাত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে কবে তার মুক্তি হবে, এবং কবে তার মনুষ্যজন্ম হবে।" একটু থেমে লামা বললেন, "তুমি জেনে রাখো, চীনের বর্তমান শাসকরা ওই ইলাপাত্রের সন্তান, তাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।"

তারপর ইতিহাস বলতে লাগলেন সাংগে রিমপোচে, "বুদ্ধের নির্বাণের একাদশ শতক পরে, অর্থাৎ ষষ্ঠ খ্রীষ্ট শতাব্দে, তিব্বতে তোং-দেৎসেন নামে রাজা ছিলেন। সেই দূরকালেও চীনারা একটা গোলমাল বাধিয়েছিল। তখন তোমাদের এই ভারতের বিক্রমশিলার মঠ থেকে কমলশীল নামে এক ভিক্ষু তিব্বতে যান এবং প্রকাশ্য সভায় চীনাদের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করেন, তর্কে তারা হারে, এবং তখন তিব্বতীরা চীনাদের সে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এক শ' বছর পরে লাসার তদানীন্তন রাজা স্রং-স্তান-গাম্পো চীনা নরপতি তাই-সুনকে পরাস্ত করে তাঁর কন্যা রাজকুমারী ওয়েনচেনকে লাসায় লাসা-রাজের স্ত্রীরূপে পাঠাতে বাধ্য করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই বিয়ে হয়। এখন সেই চীনাদের স্পর্ধা দেখ—এখন তারা আমাদের বিখ্যাত আমদো এলাকা কেড়ে নিয়ে তাদের চিংঘাই জেলার অংশ করে নিতে চায়! সেই চীনারা এখন সারা তিব্বতটাই গ্রাস করেছে। স্থির জেনো, দলাই লামার এই আগমন হচ্ছে তিব্বত থেকে চীনাদের বিতাড়নের সূচনা। আর একজন কমলশীলের অভ্যুদয় এবার হবে, চীনা আক্রমণকারীরাও বিতাড়িত হবে।"

চৌখম্বির উপরে অস্তসূর্যের শেষরশ্মি পড়েছে, পেমা আমার কাছে এসে বিদায় চাইল, আমি তাকে যেতে দিতে রাজি না। "তোমাকে সকলে চেনে। আমাদের শেষ চেকপোস্ট নিরাপদে পার হতে কি পারবে?"

"আমিও শুনেছি ভারত-তিব্বত সীমা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তবু আমরা যথাসাধ্য করব। নিজের দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে।"

"তোমার মাথার আঘাত এখনো সারেনি।"

"তাতে কোন কষ্ট নেই। খুব আনন্দ পেয়েছি উড়ে। তুমি ছিলে বলেই সম্ভব হল।"

শোভাযাত্রা করে তিব্বতীরা রেল-স্টেশনের দিকে চলেছে। পেমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে অপেক্ষা করছিল, সে একটু ব্যস্ত হল। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শেষ কথা আমাদের ভালো করে বলা হল না।

ট্রেন অল্পক্ষণ থামে। আগের স্টেশন থেকেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ঠাসাঠাসি হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়ে তিব্বতীরা উঠল। হিমালয়ের পাদমূলে পৌঁছতে দু' রাত্রি ও দু' দিন তাদের কাটাতে হবে।

পেমা গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছে, আমিও উঠে দাঁড়ালাম, এবং একটা খামে ভরে তার হাতে কতকগুলো নোট দিলাম। সাংগে রিমপোচে আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "নমো তস্‌সো ভগবতো অর্হতো সম্ম-সম্বুদ্ধস্‌স—তাঁকে নমস্কার কর, হে অর্হৎ সেই ভাগ্যবানকে—যিনি পূর্ণ আলোকের আশীর্বাদ পেয়েছেন।"

ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তার গতি বাড়ল। তার পর একটা বাঁকের মুখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ আমি ঘুমতে পারলাম না। হিমালয়ের পক্ষে আমার কর্তব্য কাজ আরম্ভ হল। তিব্বতী বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সেই উচ্চ প্রদেশে

পৌঁছতে পারবেন কি না কে জানে, পেমাও ধরা পড়ে জেলে যেতে পারে, এমনকি তার চরম দণ্ডও হতে পারে।

যন্ত্রচালিতবৎ আমি গাড়ি নিয়ে ছুটলাম সেইদিকে, যেদিকে তিব্বতীদের নিয়ে যাত্রা করেছে ট্রেন।

পরদিন সকালেই আমি পাটনা এয়ার-পোর্টে পৌঁছলাম। এক পাইলট বন্ধু বললেন যে পরদিন তাঁকে বিমানে পূর্ণিয়া যেতে হবে, এবং যদি সব ঠিক থাকে তিনি আমাকে হিমালয়ের পাদদেশের কোনো বিমানঘাটিতে নামিয়ে দিতে পারেন। তিব্বতী বন্ধুরা সীমান্ত পার হওয়ার আগেই আমার তাদের সঙ্গে মিলিত হবার সম্ভাবনা তাহলে আছে।

সত্যি, আমি তাই করলাম। আমি যখন পৌঁছলাম তখন তারা আমাদের শেষ চেকপোস্ট পার হয়ে এক সিকিমী সীমান্ত-প্রহরীর সঙ্গে চা পান করছে। চীনারা যাতে দেখতে না পায় এজন্যে তারা সকাল হওয়ার আগেই সীমান্ত পার হবে ঠিক করেছে।

রাত্রির ঠাণ্ডায় শক্ত হয়েছে বরফ। তার উপর দিয়ে আমরা হাঁটা দিলাম। ১২০০০ ফুট ঊর্ধ্বের চাঙ্গু হ্রদ জমে গিয়েছে। আরো উপরে ১৪০০০ ফুট উঁচুতে নাতু-লা গিরিপথ তুষারে ঢাকা পড়েছে। ভুটানী আকাশে যখন আলোর সামান্য আভাস দেখা দিয়েছে, আমরা তখন শৃঙ্গে পৌঁছেছি। কিন্তু ওইটুকু আলোতেই চারদিক এত ঝরঝরে পরিষ্কার দেখাচ্ছে যে, ষাট মাইল দূরের চমলহরি পাহাড় স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল।

পর্বতের ও গিরিপথের সম্মানে আমরা পতাকা, কিছু বিস্কুট ও পাথর সেখানে রাখলাম। লামারা মৃদু স্বরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন।

কেউ না শোনে এইভাবে পেমা বলল, "আমি যাই?"

"এটা বিদায়-সম্ভাষণ নয়।"

"আমি আবার তীর্থযাত্রায় আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

সাংগে রিমপোচে চাপা গলায় বললেন, "খালি হাতে আমরা ফিরব না। তিব্বতের ও হিমালয়ের এ সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সমস্যা।"

তারা হেঁটে চলল সেই তুষারপ্রান্তরে, ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগল অগণিত গিরিচূড়া। কুয়াশা ও তুষারবৃষ্টি ছাড়া তাদের এই অগ্রগমনে বাধা নেই কিছু।

"এই দেখ," পেমা নীচু হয়ে তুষার খুঁড়ল এবং কি যেন তুলল, "তুটি ফুল।" এতে বোঝা যাচ্ছে তিব্বতে বসন্ত এসে গিয়েছে। ফুল-ত্নটি আমরা বদল করে নেব নাকি? এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে—তিব্বতের ও হিমালয়ের।

হাতের ফুল সে ঠোঁটের চাপে ধরে দু'হাতে আমার ফুল-সমেত হাত-দুটি ধরল। তারপর ঢালু পথে সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে দৌড় দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইরাটুংয়ের দিক থেকে মোটরের শব্দ শোনা গেল। বিদ্যুতের মত আলোর চমকও দেখা গেল; এবং তখনি ভীষণ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারধার।

কিন্তু তিব্বতীরা দল বেঁধে মার্চ করে চলেছে। এরই মধ্যে সাংগে রিমপোচের চাপা গলাও বেজে উঠল, "ওরা সমস্ত তিব্বতকে হত্যা করতে পারবে না।"

দূরে চমলহরি ও পেমা যেন মিশে এক হয়ে গেল।

ওই দুটি কিছুতেই বিনষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়

১। খাম্বাদের তিব্বতে—সেই গিরিপথের উপরে

"এই সেই গিরিপথ। একটি বিশ্বযুদ্ধ কিংবা অখণ্ড বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে এই গিরিপথের উপরে।" টহলদারী অফিসার জিগমে আমাকে বলল। ১৪,০০০ ফুট এই উঁচুতে সে উঠে এসেছে আমাকে সমতল ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। অনবরত আমি ভারত-তিব্বত সীমা পারাপার করছি, এই জন্যে তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। জিগমে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। যখনই আমি তিব্বতে গিয়েছি, তখনই তার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এ ঘটনা ১৯৫৯ মার্চ মাসের শেষের দিকের। ওই সময় দলাই লামা নিরাপদে বাসের জন্যে ভারতভূমির দিকে রওনা হয়েছেন। আমাদের ভারত সীমান্তে কি-সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে জিগমে আমাকে বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছে।

তুষার পড়তে আরম্ভ করেছে। আমরা তার আবরণে একেবারে শুভ্র হয়ে উঠছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের সম্মুখে তিব্বতের শোভা মুছে যাচ্ছে না।

জিগমে বলতে লাগল, "সাধারণত এই নাতুলা গিরিপথ দিয়েই ভারত ও তিব্বতের শতকরা নব্বই ভাগ যোগাযোগ-ব্যবস্থা। এর এই গুরুত্বের জন্যেই চীনারা একে লাসার রাস্তায় যোগ করে নিয়েছে, এবং সেখান থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত। এই প্রবেশপথটিকে চুম্বি উপত্যকা বলে, বাস্তবিক পক্ষে এইটেই তিব্বতে প্রবেশের সদর দরজা। দশ বছর আগে চীনারা যখন এই উপত্যকায় প্রবেশ করে, তখন তারা সামরিক কায়দায় এখানে সেনাবাহিনী গড়ে তোলে, এবং এখানে এমনভাবে ঘাটি তৈরি করে, যাতে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিপদ দেখা দেয়। যে-কোনো ম্যাপে এই উপত্যকা দেখতে পাবে, এবং দেখে মনে হবে যে

ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডে যেন প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। যখনই চীনারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতে আরম্ভ করবে, তখনই চীন-ভারত মৈত্রীর অবসান হবে, এবং পরিণামে তা বিশ্বযুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।"

"চীনারা কি এইখান থেকে ওই ভাবে এগোবার প্ল্যান করেছে?"

"আমরা যতদূর খবর পেয়েছি, এই সপ্তাহে তারা লাসা থেকে এই অবধি মোতায়েন তাদের সেনাদের হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। এ কাজে তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, ওই সেনারা দলাই লামাকে পাকড়াও করার জন্যে যাতে প্রস্তুত থাকে, সেইজন্য এই হুঁশিয়ারি। ভুটান সীমান্তের কোনো জায়গায় দলাই লামাকে পাওয়া যাবে বলে তাদের বিশ্বাস। এসব ব্যাপারে চীনাদের মতলব বোঝা দায়, দলাই লামাকে আটকাবার এ কথাটা হয়তো ছলনা মাত্র; তারা ভারতবর্ষের কোনো উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়তো দখল করতে চায় এবং সেখান থেকে একেবারে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা। সে যা-ই হোক, এইখানে চীনাদের বর্তমান চাল-চলনটা ভারতের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক।"

আরো গভীরভাবে তুষার পড়তে আরম্ভ করল। এতে তিব্বতের চারিদিকের দৃশ্যের উপর ঘন যবনিকা নেমে এল। ওই যবনিকা ভেদ করে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি চীনা সেনা বেরিয়ে এল, তাদের কাঁধে ক্ষুদে মেশিনগান। আমাদের নিকট থেকে প্রায় পাঁচ গজ দূরে দাঁড়াল তারা, তারপর হিন্দি ভাষায় বলে উঠল, "নিকাল যাও। ইয়ে চীনা টেরিটরি হ্যায়।"

জিগমে তার রিভলভার তুলে জবাব দিল, "নিকাল যাও? ইয়ে ইণ্ডিয়ান টেরিটরি। গো ব্যাক।"

হঠাৎ এই জবাবে, এবং এমন কড়া হুকুমে, তার উপর ওই আগ্নেয়াস্ত্র দেখে চীনারা থ' হয়ে গেল। তাদের উঁচু উঁচু নোংরা দাঁত বার করে

ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে তারা নরম ভাব দেখিয়ে বলল, "চীনি-হিন্দি ভাই-ভাই।" কথাটা তারা দু'বার উচ্চারণ করল।

কাছে গিয়ে তাদের ভালো করে দেখলাম। দেখলাম, শতছিন্ন সুতীর প্যাড দিয়ে তাদের শরীর জড়ানো, সে প্যাড দড়ি দিয়ে তাদের গায়ের সঙ্গে বাঁধা। তাদের এই দৈন্য দশা দেখছি এমন সময় তারা কিছু ভারতীয় মুদ্রা ও কিছু খাদ্য চাইল। আমি একটা দু-আনি দিতেই, চীনাটা সামান্য একটা ভিখারীর মত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, "তুমি যা দিলে এ আমার দু'দিনের মজুরি। আমাদের সরকারের কাছ থেকে আমরা কাগজের নোট পাই, যার দাম হচ্ছে এই গিরিপথে যে কাগজের তিব্বতী পতাকা উড়ছে তার চেয়েও কম। আমাদের উপরওলারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, এবং আমাদের রসদ খেয়ে ফেলে। এইখানকার ক্ষুধার্ত পাহাড়ি ইঁদুরের চেয়ে আমরা ভালো নেই। আমাদের উপর আদেশ এই যে, প্রার্থনারত তিব্বতীদের মাথার উপর বন্দুক রেখে তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তাদের খাদ্য কেড়ে খাওয়া।"

এই কথা শুনে জিগমে বলল, "অবস্থা যদি এমন, তাহলে তোমরা তোমাদের কমিউনিস্ট মনিবদের চাকরি কর কেন?"

"এ ছাড়া আমরা করব কি। আমাদের পরিবারের লোকজনদের তারা চীনে আটক করে রেখেছে। চীনা সেনাবাহিনী যে মুহূর্তে আমরা ত্যাগ করব, অমনি তাদের একেবারে শেষ করে ফেলবে ওরা। আর এ কাজ ছেড়ে আমরা যাব কোথায়? ভারতবর্ষে? সেখান থেকে আমাদের তো তুলে দেওয়া হবে চীনা কর্তাদের হাতে। তখন কর্তারা আমাদের উপর পীড়ন করতে করতে আমাদের মেরে ফেলবে। আমাদের উপর সব সময় কড়া নজর রাখা হচ্ছে, আমরা তাদের খপ্পর থেকে পালাবার আগেই আমাদের তারা গুলি করে বিনাশ করবে।"

চীনা সেনাবাহিনীতে সৈনিকের জীবন সম্বন্ধে তারা যে বিবরণ দিল তা বড় মজার। ভারতবর্ষে আমরা যে ধারণা পোষণ করি তার থেকে

সম্পূর্ণ আলাদা। অপর সেনাটিকে আমি আর-একটি দু-আনি দিতেই সে আর-একটি কাহিনী বলল, "আমাদের প্রকৃত অবস্থা কাউকে বলা বারণ। কিন্তু চারদিকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। আমরা যতদূর জেনেছি তাতে বুঝতে পারছি শিগগিরই ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে বড় রকমের সংঘর্ষ আরম্ভ হবে। আমাদের অফিসাররা খোলাখুলি ভাবেই এ সম্বন্ধে কথা বলছে। এখন, চীনা খপ্পর থেকে পালাবার এই একটা মস্ত সুযোগ। যদি ভারতবর্ষ কেবল এই আশ্বাস দেয় যে তারা আমাদের চীনাদের হাতে ফেরত পাঠাবে না, তাহলে পৃথিবী দেখে চমকে যাবে—চীনা সেনাবাহিনীর কি পরিমাণ সৈনিক তাদের বাহিনী ত্যাগ করে। কেবল ব্যাটেলিয়ন নয়, এক-একটা করে ব্রিগেড, এমনকি চীনা সেনার পুরো ডিভিশনই অস্ত্র ত্যাগ করে ভারতের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে। আমরা কমিউনিস্ট অত্যাচারীদের এমনই ঘৃণা করি যে, আমরা আমাদের বন্দুকের নল তাদের বুক সই করে বসাতে পারি।"

এমন বাক্পটু চীনা সেনা দেখা এই আমার প্রথম। তারা গল্প চালিয়ে যাবার জন্যে আরো কিছু ভিক্ষা চাইল। কিন্তু জিগমে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, "ওদের আর কিছু দিয়ো না। ওরা হচ্ছে চীনা দস্যুর দল। তোমার সঙ্গে কত টাকা আছে ওরা তা জানার চেষ্টায় আছে। ওরা যদি এই রিভলভার না দেখত তাহলে যে চার আনা তুমি পকেট থেকে বের করেছ, ওই চার আনার জন্যে আমাদের আক্রমণ করতে পারত।"

আমাদের এই শক্তির প্রতীকটাই অনেকটা কাজ করেছে। তারা যেভাবে তিব্বতীদের কাছ থেকে খাদ্য আদায় করছে, ওই ভাবে আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টায় ছিল। তাদের ঝকমকে অস্ত্রই আছে, কিন্তু তাদের উপরওয়ালা তাদের বিশ্বাস করে বুলেট দেয়নি। এতেই, তাদের মনের জোর গিয়েছে ভোঁতা হয়ে। এইজন্যে, জিগমের রিভলভারে যে টোটা আছে, এবং তার রিভলভার তোলবার অর্থ যে

দরকার হলে গুলি ছুঁড়বে তা অবশ্য তারা বিশ্বাস করেছে। এইজন্যে এই চীনা টহলদারদের স্পর্ধা ও ধাপ্পা দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম।

ওই সেনা-দু'জনের মধ্যে যে চাঁই, সে বলল, "এই সীমান্তে আমাদের পাঠাবার আগে প্রচারকরা নানা কথা বলে আমাদের উত্তেজিত করে তোলে। সেই উত্তেজনার নেশায় আমরা এখানে এসেছি। এই গিরিপথে যে-ভারতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হব বলে আমরা শুনেছি, তার সম্বন্ধে আমাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আজ সকালেই।"

"কি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে?"

"আমাদের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাইয়ের স্বাস্থ্য পান করে সেই অনুষ্ঠান করা হয়। তোমরা নিশ্চয় জান, খুব উঁচু পদের চীনা অফিসাররাই কেবল মদ্যপানের বিলাসিতা করতে পারে। আমরা পাই মেথিলেটেড স্পীরিট। তাতেও জল মিশিয়ে নিতে হয়। কেননা, স্টেটের এই সম্পদ আমরা চুরি করছি—এই অপরাধে তা না হলে আমাদের চাবুক খেতে হবে।"

"কি ভাবে পানোৎসব হল?"

"আমাদের রাজনৈতিক ধুরন্ধররা গ্লাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—যিনি এই অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছেন আমাদের সেই মহান প্রধানমন্ত্রীর জয়। তাঁর পররাষ্ট্র নীতির ফলে দুই-তিনটি ভারতীয় সেনাবাহিনী মুশকিলে পড়েছে। এখন, ভারতের উর্বর কয়েকটি এলাকা দখল প্রায় আমাদের হাতের মধ্যে। এর জন্যে হয়তো আর বুলেট খরচ করতে হবে না। যেখানে যতটা জায়গা অরক্ষিত পাবে হিমালয়ের ওপারের সেই জায়গা চীনের বলে দাবি করবে। এগিয়ে যাও, এবং সৎকার্য সাধন কর।"

এই কথা প্রসঙ্গে সে আরও বলল, "চীনাদের যদি মনোবল থাকত তাহলে তারা ভারতের আরো ভিতরে প্রবেশ করতে পারত। কিন্তু তোমরা জান, তিব্বতে চীনারা কতটা মনোবল হারিয়েছে, এবং কতটা

অসন্তোষ নিয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে বেশি আশা করতে পার না। সত্যিকারের যুদ্ধ বাধলে কি হবে, সেকথা না হয় বাদই দাও।"

গিরিপথটির উপরিভাগে তুষার পড়ে সীমারেখা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কেবল, পর্বত-দেবতার ও ভগবান বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে যে তিব্বতী শ্বেত পতাকা উড্ডীন করা আছে সেগুলি তুষারাচ্ছন্ন হয়নি।

চীনা টহলদারদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে জিগমে বলল, "ওই যে উঁচু পর্বত দেখছ ওগুলি আমাদের। ওর সম্মান কোরো। আর এগিয়ো না।"

আর কোনো তর্ক না করে চীনা টহলদারেরা পিছিয়ে গেল, এবং তিব্বতের দিকের ঢালু পথে নেমে অদৃশ্য হল।

খাপের মধ্যে রিভলভার রেখে দিয়ে জিগমে আমাকে টানল, বলল, "তোমার তিব্বতে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু তিব্বত পালিয়ে যাচ্ছে না। এস, এবার কিছু খাবার খেয়ে নিই। তোমার তিব্বতযাত্রার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

খুব বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। এইজন্যে কিছুই আর দেখা যায় না। কিন্তু জিগমে পথটা ভাল করে জানত। তাই সে গিরিপথের কাছেই লেকের ধারে নির্মিত তার কুটিরে আমাকে নিয়ে যেতে পারল। তার কুটিরের বেড়ার কাছে পৌঁছে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার মেয়ে কোথায়—নিমা?"

"গত বছর সে রিনচেনগ্যাঙের এক খাম্বাকে বিয়ে করেছে—জায়গাটা এখান থেকে একদিনের হাঁটাপথ।"

"সে ভালো আছে নিশ্চয়?"

"আজকাল তিব্বতের কি শোচনীয় অবস্থা তা তুমি জান।"

সে তার ঘরের আলো জ্বালল। দেখলাম, দেয়ালে একটা রদ্দি

সামরিক ওভারকোট ও পুরনো একটা রাইফেল ঝুলছে। সেগুলো আমাকে দেখিয়ে সে বলল, "এগুলি বাড়তি জিনিস। তুমি এগুলো নিতে পার—নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। তিব্বতে গিয়ে দরকার হলে ব্যবহার করতে পার। সেখানকার পক্ষে এগুলো খুবই আধুনিক।"

সে চা বানালো। বিস্কুটের টিন খুলল—হঠাৎ কোনো অতিথি এসে পড়লে দিতে হবে বলে বিস্কুটের টিন সে রাখত। বাইরে বাতাসের গর্জন বাজছে, ভীষণ ভাবে তুষার পড়ছে। এ-সময়ে আমার যাত্রা আরম্ভ করার কোনো কথা উঠতে পারে না। এই ঘরটা আমার কাছে এই দুর্যোগে খুবই আরামদায়ক মনে হতে লাগল। জিগমে বলল, "আমাকে আবার ডিউটিতে বেরতে হবে।"

"এই তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে?"

"এ আমার প্রত্যহের কাজ।"

"এখন কোথায় যাবে?"

"মাইল-খানেক দূরে আর-একটা গিরিপথ আছে, সেটা একেবারেই অরক্ষিত। এই তুষারপাতের সুযোগ নিয়ে ওই পথ দিয়ে কিছু কিছু চীনা এদিকে ঢুকে পড়তে পারে। তা ছাড়া, চেকপোস্টে গিয়ে জানাতে হবে যে আজ আমরা আমাদের এলাকায় দু'জন চীনার সাক্ষাৎ পেয়েছি।"

জ্বলন্ত চুল্লীর কাছে তিব্বতী কায়দায় শুয়ে আমার চোখে তন্দ্রা এল। পাহাড়ের দেশের বাতাসের হিসহিস শব্দ আমার কানে ঘুমপাড়ানি গানের মত মনে হল। কিন্তু এই সুউচ্চ জায়গায় আমি আছি—এই চিন্তাটা আমার মন থেকে কল্পনা সরিয়ে দিয়ে আমাকে যেন পুরোপুরি বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করল।

আমার মনে হল, আমি বুঝি তিব্বতেই এসে গেছি। খুব বরফ পড়ছে। আর, আমি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি একজন লামা ও তার অনুচরের সঙ্গে। অনুচরটির নাম পেমা, কিংবা, নিমা। এই বরফের মরুভূমিতে যেন আমি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কতকগুলি

চীনা সেনা আমাদের আক্রমণ করল। আমাদের সবকিছু তারা কেড়ে নিল। আমাদের তারা বেঁধে ফেলল, আর মেয়েটাকে আদেশ করল তাদের অনুসরণ করতে। কিছু দূরে গিয়ে তারা আমাদের দিকে বন্দুক তাক করল। কিন্তু বন্দুকে গুলি ছোঁড়া গেল না। এই সময় আমার ঘুম গেল ভেঙে, আমি জেগে উঠলাম।

জিগমে আমার হাত ধরে টেনে বলল, "উঠে এস, তোমার তিব্বত-যাত্রার সব ব্যবস্থা প্রস্তুত।"

পাহাড়ি ঝঞ্ঝা একটু কমেছে। চারদিকে বরফের উপর রৌদ্র ঝলমল করছে। আমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে জিগমে বলল, "এও এক রকমের ভবিষ্যদ্বাণী। এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

চেকপোস্টের দিকে যাবার সময় আমরা একটি খচ্চরের বাহিনী দেখতে পেলাম—তিব্বতের দিক থেকে আসছে। জিগমে ওই ক্যারাভ্যানের কাছে ওপারের খবর জানতে চাইল। ওদের দলপতি বলল, "চীনারা বর্তমানে প্রকাশ্যে সকলকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে; এর থেকে লামাদেরও নিস্তার নেই, ভারতীয়দেরও রেহাই নেই। এই উৎপীড়ন এতই ভয়াবহ যে, মনে হয়, এর চেয়ে গুলি করে মেরে ফেলাও অনেক ভালো।"

"ভারতীয়দেরও ওইভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে—এ বিষয় তুমি খুব ভালো করেই জানো?"

"মাত্র তিন দিন আগে আমার চোখের সামনে চীনাদের একটা নিষ্ঠুর আচরণের দৃষ্টান্ত তাহলে দিই। একজন নেপালী ব্যবসায়ীর—সে একজন ভারতীয় প্রজা—কিছু কাপড় ওষুধপত্র মজুত ছিল, সেগুলি সে তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যাবার জন্যে চেষ্টা করছিল। কয়েকজন খাম্বা সেগুলি কিনে নিয়ে রূপার মুদ্রায় তার

দাম দেয়। সেই মুদ্রা নিয়ে ব্যবসায়ীটি রওনা হয়েছে। চীনা চেক-পোস্টের কাছে সে এসে পৌঁছলে তাকে তল্লাসী করা হয় এবং তার সবকিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার উপর চীনা-বিরোধী খাম্বার কাছে মাল বিক্রির অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। ব্যবসায়ীটি বলে যে, সে চীনাদের কোনো ক্ষতি করেনি, এবং সে ভারতীয় প্রজা, এইজন্যে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো অধিকার চীনাদের নেই। কিন্তু চীনা কম্যাণ্ডার ও-কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর আদেশ পালন করিয়ে নেন।"

"শাস্তিটা শেষবেশ দিল কে ?"

"একটা কসাই। ওই গ্রামের লোক সে। চীনা সেনাকর্তারা তাকে তিব্বতীদের মেষ ও ইয়ক কেড়ে নেবার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। এবং সেগুলি হত্যা করে চীনা সেনাদের মাংস সরবরাহ করতে হুকুম দিয়েছে, পরিবর্তে তাকে টাকা দেওয়া হয়—কাগজের নোট।"

"শাস্তি পাওয়ার পর ওই ব্যবসায়ীর কি হল ?"

"ওই জায়গায় তারা তাকে ফেলে চলে গেল—ওইখানে পড়ে ও মরুক। কিন্তু ব্যবসায়ীটি শক্ত ধাতুতে গড়া, মনে সাহসও খুব। সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে। চীনারা তাকে আবার পাকড়াও করে ওই কসাইয়ের হাতে তুলে দেয়—যেন লোকটার দুই হাত কেটে ফেলা হয়। কিন্তু কয়েকজন খাম্বা তাকে উদ্ধার করে—খাম্বারা তখন ওই পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও সে তখন আধমরা, তবুও সে ভারত সীমান্তে পৌঁছয় এবং অবশষে ভারতভূমিতেও পৌঁছে যায়। কিন্তু তাকে পুনরায় পাকড়াও করে চীনারা, এবং তার পর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি চীনারা কি রকম আচরণ করেছে এটা তার একটা দৃষ্টান্ত।"

জিগমে বলে উঠল, "আমরা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করব।"

"তিব্বতী এলাকায় কি করে এর খোঁজ করবে ?"

"আমাদের ট্রেড-এজেন্সি মারফত।"

"কি আশ্চর্য !" লোকটা বলল, "তোমাদের ট্রেড-এজেণ্টরা বলতে গেলে বন্দী। রাইফেলধারী চীনা সেনারা তাদের আবাস পাহারা দিয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে, ভারত সরকার এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই করবে না।"

আমরা আমাদের চেকপোস্টের দিকে চলেছি। চারদিকে নির্জন পার্বত্য উপত্যকা, তার মধ্যে দিয়ে তলোয়ারের মত দেখতে ছোট ছোট নদীর ধারা। সবই তুষারে ঢাকা। সূর্য অস্তমুখে। তাপ ক্রমেই নেমে যাচ্ছে—শূন্য ডিগ্রিরও নীচে নামছে তাপমাত্রা। জিগমে আমার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কি তবে ফিরে যাবে ?"

"হঠাৎ ও-কথা কেন !"

"তিব্বতে গিয়ে তুমিও অমনি উৎপীড়নের মধ্যে পড়তে পার, তোমাকেও হয়তো ওই ভাবেই পীড়ন করবে।"

"সম্ভব নাও হতে পারে।"

"যদি তুমি যাবে বলে স্থির করে থাক, সীমান্তরক্ষীরা তোমাকে বাধা দিতে পারে। আমি তোমাকে তার জন্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি তোমাকে ভিসা-পাসপোর্ট, গরম পোশাক ও ভালো বন্ধু যোগাড় করে দেব।"

তার এই কথায় আমি মনে নতুন বল পেলাম। এই অজানা পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এ যে মস্ত ভরসা।

সহজেই আমার নামে একটি ট্রেডার্স পাস ইস্যু করে দিল। আমার জন্যে জিগমে এক ভোটিয়া ব্যবসায়ী যোগাড় করল ; তাতে আমার সুবিধে হল খুব। ব্যবসায়ীটির নাম নরবু। সে একজন ভারতীয় বাসিন্দা, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে তিব্বতে তাদের কারবার। আমার দরখাস্তের উপর তার স্বাক্ষর পাওয়া মাত্র আমি ভারত ও চীন-অধিকৃত তিব্বতে একজন ব্যবসায়ী বলে গণ্য হয়ে গেলাম।

হ্যাতে তিব্বত যাবার পাস নিয়ে ভোটিয়া ব্যবসায়ীর কুটিরদ্বারে যখন পৌঁছলাম তখন চারদিকে আলকাতরার মত কালো অন্ধকার। তার পরনের বাকুর আড়ালে লণ্ঠন ঢেকে নিয়ে ফটকে এসে সে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, এবং আমাদের একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে বিস্তর মালপত্র প্যাক করা হচ্ছে। নরবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, দেখতে খাঁটি তিব্বতীর মত, খুব কর্মঠ আর ভারিক্কে।

"চীনাদের যতটা চালাক ভাব, তারা তত চালাক নয়।" নরবু বলল, "যদি তাদের হালচাল ভালোমত চিনতে পেরে থাক তা হলে তাদের বোকা বানানো খুব শক্ত না। তারা তিব্বতের শাসক হওয়ার পর থেকে আমি আমার বুদ্ধি খাটিয়ে চলেছি, এবং তাতে কাজ মন্দ হচ্ছে না। কাল আমি তিব্বত যাত্রা করছি, আমার সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভাবনা নেই। তাদের নিজেদের অস্ত্র দিয়ে চীনাদের কি ভাবে ঘায়েল করতে হয় সহজে শিখে নিতে পারবে। তাদের ধাপ্পা আর প্রপাগাণ্ডা থেকে নিজের দেশের সীমানা কি ভাবে রক্ষা করতে পারা যাবে, এর দ্বারা সে অভিজ্ঞতাও হবে।"

পরদিন সকালে আমরা গিরিপথে মিলিত হব ঠিক হল। আমি জিগমের সঙ্গে চললাম, রাত্রিটা তার কুটিরেই কাটাব বলে। একটু গিয়েই এক লামার সঙ্গে দেখা। তিনি ব্যস্ত হয়ে জিগমের কাছে একটা জরুরি খবর পৌঁছে দিতে আসছিলেন। পাহাড়ে ওঠার জন্যে তত না, যতটা উত্তেজনায়, তিনি হাঁপাচ্ছিলেন, বললেন, "তিনদিন হল তোমার মেয়ের এক ভয়ংকর বিপদ ঘটেছে! কী কাণ্ড!"

"সে বেঁচে আছে তো?"

"কেউ নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না। এখন তিব্বতে যা ঘটছে সবই লাসা থেকে দলাই লামার অন্তর্ধানের সঙ্গে যুক্ত। এখন তিব্বতে যেভাবে মানুষ খোঁজা হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা কখনো হয়নি। চীনারা এখন ভাবছে যে-কোনো কুটির থেকে দলাই লামাকে

পাওয়া যাবে। দলাই লামার পলায়ন ও নিরাপত্তার জন্যে যে খাম্বাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি, সেই বলিষ্ঠ খাম্বা জাতির উপর এখন অমানুষিক পীড়ন চলেছে। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে একজন খাম্বার সঙ্গে ?"

জিগমে রীতিমত উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে ?"

"না। শেষমুহূর্তে সে নিমাকে সঙ্গে নিয়ে চীনাদের ফাঁদ থেকে সরে পড়ে।" লামা বলতে লাগলেন, "তাদের বাড়ি তো লাসা রোডের উপরে। দলাই লামাকে খুঁজতে বেরিয়েছে এই ছলনা করে চীনা-সেনাদের এক বিরাট বাহিনী যখন ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, খাম্বারা তখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চীনাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে সরে পড়ে। তারপর চীনা সেনারা নতুন ভাবে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত খাম্বাদের নিঃশেষ করে ফেলার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এতে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার যাদের উপর হয় তারা হচ্ছে খাম্বা মেয়েরা, কেননা তাদের স্বামীরা তখন চীনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। ধর্ষণ, অত্যাচার, পাথর দিয়ে পিষ্ট করা ইত্যাদি বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ হয়। অত্যাচার করে মেরে ফেলেনি এমন কম মেয়েই আছে।"

"নিমাকে কখন শেষ দেখেছ বল।"

"সে তিন দিন আগে। সেদিন সকালবেলা চীনা সেপাইরা আমাদের গুম্ফায় ঢোকে এবং তা অপবিত্র করে। পাথরের উপর খোদিত বুদ্ধের মূর্তি তারা ভেঙে ফেলে, এবং সেই পবিত্র জায়গাটা নোংরা করে দেয়। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। তাদের বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তারা আমাকে অজ্ঞান করে দেয়। একজন মুচি আমাকে তার কুঁড়েতে নিয়ে গিয়ে আমার জ্ঞান ফেরায়। নিমা তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছিল। জ্বালানি যোগাড়ের

জন্যে তারা জঙ্গলের দিকে গেল, সেখান থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা আবার আসবে বলে গেল। আমার সামনেই তার বাচ্চাটাকে সে একজন মেয়ের কোলে দিয়ে গেল তাকে সেদিনটুকু দেখেশুনে রাখার জন্যে।”

“সে মেয়েটি কে?”

“তাদের প্রতিবেশী, নাম কাণ্ডো।” তারপর লামা একটু থামলেন, অবশেষে বললেন, “ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে কাণ্ডো তোমার মেয়ের ঘরের দরজায় পা দেওয়া মাত্র এক-ঝাঁক চীনা সেপাই সেই রাস্তায় এসে উপস্থিত। ওই ঘরে কারা থাকে এ-খবর আগে থেকেই তারা নিয়ে এসে থাকবে। দুইজন সৈনিক কাণ্ডোকে দুই পাশ থেকে ধরে জঘন্য ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু কাণ্ডো বুকে চেপে ধরে আছে শিশুটিকে। তারপর ওই চীনারা তার উপর ছুঁড়তে লাগল পাথর। সে বলতে লাগল, এর চেয়ে তাকে গুলি করা হোক। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মেয়েটার শেষ উক্তি হল বুদ্ধের উদ্দেশে প্রার্থনা। আর প্রাণ সম্পূর্ণ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চীনা সৈনিকরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।”

ওই বার্তা শুনে কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর লামা আমাদের হ্রদের কিনারের কুটিরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেন, জিগমে মেঝের উপর টান হয়ে শুলো, আমি শুয়ে পড়লাম একটা পাথরের উপর।

চারদিকে নিস্তব্ধ—ঠাণ্ডা।

পরদিন সকালে লামার প্রার্থনার ধ্বনিতে ও দূর থেকে আগত খচ্চরের গলার ঘণ্টার টুংটুং শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম, বরফাচ্ছন্ন হ্রদে ও পাহাড়ি উপত্যকার উপরে চন্দ্রালোকের একটি ওড়না ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রকৃতির ঘুম যাতে ভেঙে না যায়, এজন্যে সন্তর্পণে আমরা হেঁটে

হেঁটে গিরিপথে গিয়ে পৌঁছলাম। নরবুর মালপত্র এগিয়ে গিয়েছে, আমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। ঠিক এ জায়গাটা থেকেই জিগমে আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু সে আজকে হাত নেড়ে নেড়ে আমার শুভ্রযাত্রার জন্যে শুভেচ্ছা জানাল।

আমরা ধীরে ধীরে গিরিপথের উত্তর দিকের ঢালু পথে নেমে পড়লাম। অচিরেই আসল তিব্বতে পৌঁছলাম।

২। চুম্বিথঙের সরাই

চুম্বি উপত্যকাটা দেখে মনে হয় চার ধারের সার সার উঁচু পাহাড়ের কাঁধের উপর যেন এটা বসানো। এখানকার আবহাওয়ারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সূর্যোদয়ের আগে পুব দিগন্তে মাত্র কয়েক টুকরো মেঘ ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়তে আরম্ভ করল।

হাতের ছবিটা দিয়ে দেখিয়ে নরবু বলল, "দেখ। তুষারের উপর দিয়ে কিভাবে বাতাস বয়ে চলেছে।"

"তাতে হল কি ?"

"এক্ষুনি ভীষণ তুষারঝড় উঠবে।"

বাস্তবিকই দেখতে দেখতে শাদা মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। চারদিক ঝাপসা হয়ে গেল এবং ঘূর্ণি-হাওয়া উঠল। চারদিকে শুরু হল বাতাসের গর্জন। আমরা তুষারে ঢাকা পড়ে গেলাম, আমাদের চোখও ঢেকে গেল তুষারে।

কিন্তু তবু আমরা এগুতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের সম্মুখে জমে উঠল তুষারস্তূপ, তাতে আড়াল পড়ে গেল আমাদের ক্যারাভ্যান। আমরা কোথায় আছি তা বোঝা দায় হয়ে উঠল।

একটা পথের খোঁজে চারদিকে আমরা তাকাতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। নরবু বলল, "আমাদের ভাগ্য ভালো।"

"আমার মনে হয়েছিল উল্টোটা।"

"নিশ্চয়। আমাদের ভাগ্য নিশ্চয়ই ভালো। চীনারা আমাদের পথ খুঁজে পাবে না।"

কি যেন একটা কালো জিনিস আমাদের দিকে আসছে বলে দেখতে পেলাম। ও একটা তিব্বতী কুলী। সে জিজ্ঞাসা করল, "খচ্চরদের চলার পথটা বলতে পার?"

নরবু বলল, "আমরা সেই পথের উপরেই। তুমি কি আমাদের বনরক্ষকের ঘরে নিয়ে যেতে পার?"

"বাঁয়ে ঘুরে সিধে গেলেই পাবে।"

আর নীচের দিকে না নেমে আমরা উপরে উঠে বনে ঢুকলাম। গাছের মাঝে কোনো ফাঁক নেই। নরবু একটু থেকে, তৃষ্ণার্ত খচ্চরের মত আওয়াজ করল। গাছের আড়াল থেকে উত্তর এল, "এই তুষার আমোচুকে ভাসিয়ে দেবে।" নরবু হেঁয়ালি করে উত্তর দিল, "কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি আর পাথরের নুড়ি মাত্র ভেসে যাবে ওতে।"

"গুম্ফা ভেসে যাবে না?"

"গুম্ফার পুরোহিত একটা মেষের চিকিৎসা করতে গিয়েছেন।"

তাদের কথার এই সব হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আন্দাজ করলাম যে তারা চীনাদের কোনো একটা বাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের বিষয় আলোচনা করছে।

একটা তিব্বতী কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরটা আমাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করার বদলে করল উলটো কাজ—আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বনের গভীরে গিয়ে আমরা একটা গর্তে ঢুকলাম, তার পরেই পেয়ে গেলাম একটা প্রশস্ত গহ্বর। তার কোণে আগুন জ্বেলে জায়গাটা আলোকিত করা। আমাকে বসার জন্যে

নরবু একটা কাঠের গুঁড়ি দেখিয়ে বললে, "নিজেকে গরম করে নাও। আমাকে এখানে কিন্তু কাজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে।"

তিব্বতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা খাম্বাদের এলাকায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি। তারা আগে থেকেই আমার আগমনের বার্তা জেনেছিল, এইজন্যে একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে তারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে পাঠিয়েছিল। লোকটির চেহারা ও আকার লক্ষ্য করার মত। চওড়া কাঁধ ও মুখের ভাবে প্রসন্নতা মিশে লোকটি বেশ দেখতে। তার পরনে কিষাণদের মত বাকু ও মাথার চুল মাঝামাঝি দু'ভাগ করা।

নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলল, "আমার নাম দোরজে। আমি পেমার ভাই। আর কোনো পরিচয় নিশ্চয় দরকার নেই?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পেমা কোথায়?"

"খুব জরুরি কাজে তাকে অন্যত্র যেতে হয়েছে, কিন্তু আশা করি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে ফিরবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চরম সময়ে তুমি এসেছ।"

"কিন্তু বাইরের জগৎ এ-বিষয়ে অতি সামান্যই জানে।"

"সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে। আমার ছাত্রজীবন আমি দার্জিলিঙে কাটিয়েছি। তখনই অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। কোনো দেশ যদি বিদেশী সেনার দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে তার মুক্তির সহায়তা করা প্রত্যেক জাতির কর্তব্য। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, নিপীড়িতকে অন্য জাতি সাহায্য করেছে। কিন্তু তিব্বতের ব্যাপারটা একেবারে স্বতন্ত্র। আমরা ভারতবর্ষের কাছ থেকে সহায়তা পাব আশা করেছিলাম, কিন্তু হতাশ হয়েছি। ভারত এ ব্যাপারে যা করেছে তার দ্বারা তিব্বতীদের সুবিধা হয়নি।"

"যথা ?"

"চীনারা তিব্বত আক্রমণের প্রথম থেকেই এই রকম দাবি করছে যে, তিব্বতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তারা পুরোপুরিভাবে তিব্বত দখল করেছে। এই দাবিটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। লাসার আশেপাশে চীনারা দলে ভারি, এইজন্যে এই জায়গা ছাড়া তিব্বতের অন্য কোথাও মুক্তিসেনার দল চীনাদের স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি, তাদের সাম্রাজ্যবাদী মতলবকে পর্যুদস্ত করেছে। চীনাদের দাবি যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্যে আমরা দলাই লামার লাসা ত্যাগের ব্যবস্থা করেছি, যাতে তিনি ভারতে গিয়ে চীনাদের তিব্বত-ত্যাগের ব্যবস্থা করতে পারেন। দলাই লামার সাফল্যের দ্বারাই তিব্বতের মুক্তিসেনা-বাহিনীর সংগঠনশক্তির ও সংগ্রামকুশলতার পরিচয় পাওয়া যাবে।"

মনোরম সৌষ্ঠবের সঙ্গে আমাদের উত্তম উত্তম চীনা খানা দেওয়া হল। খানা দেখে আশ্চর্য হয়ে আমি দোরজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথা থেকে তুমি পিকিং-এর এই খাসা খানা পেলে ?"

"চীনাদের সরবরাহ-বাহিনীর উপর আমাদের হানার এই ফল।"

"কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ?"

"তারও কিছুটা ব্যবস্থা হয়েছে। হাজার সেনার এক-একটি দলের প্রায় চল্লিশটি দলকে আমরা অস্ত্রের জোগান দিতে পেরেছি। বোধ হয় জান, পুবের চামদো থেকে পশ্চিমের গারটক পর্যন্ত আমরা খুব তৎপর আছি। প্রথম দিকে রদ্দি অস্ত্রশস্ত্রের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়। তার কিছু কিছু ব্রিটিশের, কিছু কিছু আমেরিকান-দের ফেলে যাওয়া অস্ত্র। কিছু জর্মন মারণাস্ত্রও আমরা পাই। কিন্তু আমাদের গর্ব এই, আমরা অনেক অস্ত্র চীনাদের কাছ থেকেই পেয়েছি—তার কিছুর উপর অন্য রাষ্ট্রের ছাপ মারা, কিছুর উপর চীনা

অস্ত্রশালার ছাপ। ভারতীয় চেকপোস্ট আমাদের এই গোপনে অস্ত্র-পাচারে ভীষণ বাধা। যা-ই হোক, অস্ত্র যোগাড় করা এখনো আমাদের পক্ষে সমস্যাই হয়ে আছে।"

আমাদের খানার পদের যেন শেষ নেই। এমন খানার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দোরজে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলল, "আজ, ১৯৫৯ সালের ২৫শে মার্চ, তিব্বতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হতে চলেছে। আজ পূর্ণিমা। এই তিথি তোমার দেশে এবং সমস্ত বৌদ্ধভূমিতে পবিত্র তিথি বলে গণ্য। তুমি এই গুহায় ঢুকবার একটু আগে আমরা খবর পেলাম যে, দলাই লামা তিব্বতের স্বাধীনতার শপথ নূতন করে ঘোষণা করেছেন। যে উচ্চ আশার জন্যে আমরা আমাদের রক্তপাত করেছি, সেই আশা এর দ্বারা বলবৎ হল। আজ আমাদের উৎসব করার মত যথেষ্ট যুক্তি কি নেই?"

দলাই লামার গতিবিধি জানার জন্যে আমার কৌতূহল হল। দোরজে বিবরণটি বলতে লাগল, "তুমি আমাদের দেশের খুঁটিনাটি বিবরণ জান কিনা জানিনে। লাসার প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে আমাদের একটা লেক আছে, নাম ত্রিগু, উচ্চতা ১৫০০০ ফুট। এই জায়গাটা চীনাদের প্রতিরোধের জন্যে আমাদের প্রধান ঘাটি। দলাই লামা আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন, এখানেই তিনি নূতন গভর্নমেণ্ট গঠন করেছেন ও তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ নিয়েছেন। তাই আজ তারই উৎসব সর্বত্র পালিত হচ্ছে।"

"লেক ত্রিগুর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কি করে?"

"তোমরা জান যে তিব্বত অতি সেকেলে একটা দেশ, তাই না?" দোরজে একটু হেসে বলল, "ভারতের বিভিন্ন শহরে তিব্বতীরা যে গিয়েছিল, সে নিতান্ত বিনা কাজে নয়। সেখানে থেকে আমরা ছোট ছোট ট্রান্সমিটার যোগাড় করেছি। আগে তিব্বতের ডাক ও তার চলাচলের ভার ছিল ভারতের উপর। তারপর চীনাদের হাতে

সে-ভার তুলে দেওয়ার পরে অনেক দক্ষ ভারতীয় কর্মী বেকার হয়ে পড়ল। এখন তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং তার ফলে এখন আমরা বেতারে বার্তা চালাচালি করতে পারছি চীনাদের চেয়েও দক্ষতার সঙ্গে। এখানেই, এই পাশের গুহাটা আমরা বেতার কেন্দ্রে এখন পরিণত করেছি! ওখানে যার উপর এ-সবের ভার, সে তোমারই দেশের লোক, তার নাম রামু। বেতার-বিজ্ঞান ও রামু এই দুটি নাম এখন আমাদের কাছে একই অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"দলাই লামা ত্রিগু লেক অঞ্চলে আছেন জেনে চীনারা বোমা ফেলবে না?"

"আমাদের ঘাটি ধ্বংস করা সহজ নয়। চীনারা কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমাদের রক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। দলাই লামা এখন নিরাপদে আছেন। তাঁর কোনো ক্ষতি হতে পারে না। এইজন্যে আমরা চীনাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি, তারা তাদের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রও প্রয়োগ করে দেখতে চাইলে দেখতে পারে।"

টাটকা পনিরের সঙ্গে এক-বাটি কফি আমাকে দিয়ে দোরজে নিজের জন্যে হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াল, বলল, "কফি খাম্বাদের পানীয় নয়।"

তার মেজাজ খুব চাঙ্গা হয়ে ওঠবার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চীনাদের তরফ থেকে নূতন কি অভিযান আশা করছ?"

"চীনাদের ছোট ছোট দল আমাদের কাছ থেকে খুব বাধা পাবে বলে জেনেছে, সেইজন্যে তারা আমাদের ডিঙিয়ে ভারতীয় এলাকার কয়েকটা গিরিপথে পৌঁছবার চেষ্টা করবে। এইভাবে তারা নিজেদের একত্র করে নিতে যেমন চেষ্টা করবে, সেইসঙ্গে পৃথিবীকে জানান দিতে চাইবে যে, তারা খাম্বা প্রতিরোধ নিঃশেষ করতে পেরেছে, এবং তিব্বতের উপর দখল তাদের পাকা হয়েছে।"

"তাদের এ-চাল ভাঙবে কি ভাবে?"

"লাসা ও শিগাৎসি তাদের মূল ঘাটি হিসেবে পেয়ে, আমরা জানি, তারা হিমালয়ে পৌঁছবার চারটি বড় রাস্তা পাবে। প্রথমটা হচ্ছে শিগাৎসি-খাসা-ডং লাচু লাইন; দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গ্যাংসি ইয়াটুন-চুম্বি লাইন—কেননা এই পথে তারা মালবাহী গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। তৃতীয়টা হচ্ছে লাসা-লোবু-পুনাকা লাইন। আর, চতুর্থ হচ্ছে সিটাং-ত্রিগু-টাওয়াং লাইন। এখন তারা দ্বিতীয় পথ ধরে তাদের সেনা ও সরবরাহ নিয়ে আসাই সুবিধে মনে করবে। কেননা, তারা ইয়াংটুকে অগ্রবর্তী ঘাটি করতে যাবে। তাদের সেনা ও রসদ চুম্বিতে পৌঁছলে তারা সেখান থেকে নিকটস্থ হিমালয়ের চার ধারে তা ছড়িয়ে দিতে পারবে। তাদের এই শেষ অগ্রগমন যদি সফল হয় তা হলে সেটা আমাদের পক্ষে মারাত্মক, কেননা দলাই লামা ভারতে পৌঁছনোর আগেই তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। এইজন্য আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে গ্যাংসি ও ইয়াটুঙের মাঝে তাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ আমাদের হবে বলে মনে হচ্ছে।"

দোরজের এই সব কথায় আমি একটু আশ্চর্য হলাম। সে বেশ তাড়াতাড়ি এই সব রণকৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছে। উৎসবের আড়ম্বরটাও সেদিনের জন্যে আমাদের এইখানে থাকতে প্রলুব্ধ করল।

বিকেলের দিকে আবহাওয়া ভালো হয়ে গেল। ইয়াটুঙের দিকের সদর রাস্তার উপরে মাইল দুই দূরে চুম্বি গ্রামের কুটিরগুলি দেখা গেল। বরফের উপর রৌদ্র পড়ায় চার দিক ঝলমল করছে, একজন খাম্বা-পথপ্রদর্শককে নিয়ে আমি একটু বেড়াতে বের হলাম। একটি গ্রাম্য-উদ্যানের বাঁকে পুরনো রাস্তা বাদ দিয়ে একটা সর্টকাট রাস্তা। গ্রাম-বাসীরা মাটি কেটে জায়গাটাকে মাটির নীচের একটা টাউন-হল ও

সরাইখানা বানিয়েছে। টিন, ত্রিপল ও সাধারণ কাঠ ব্যবহার করে তারা বানিয়েছে ছাদ।

স্বাধীনতা-উৎসব-পালনের জন্য দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন এসে সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। তীরের মত দ্রুত চলতে পারে খাম্বা-বার্তাবহরা—তারা চার দিকে খবর দিয়ে এসেছে। এর আগে তারা বলে বেড়িয়েছিল যে, খাম্বাদের খাদ্য জোগান দেওয়া ভালো, নইলে সে খাদ্য চীনারা কেড়ে নেবে। কিন্তু আজ তারা বলে এল যে, চীনাদের সরবরাহ-বাহিনীর উপর হানা দিয়ে তারা প্রচুর খাদ্য যোগাড় করেছে।

সম্মিলিত মানুষদের উৎসাহ দেখে কে! তাদের যে-সব মূল্যবান সম্পদ তারা রক্ষা করতে পেরেছে তার সবই নিয়ে এসেছে—স্ত্রী ছেলেপিলে পাহাড়ি ষাঁড় মুরগী, সব। সরাইখানায় তাদের জন্যে জায়গা অপর্যাপ্ত।

এই প্রশস্ত আস্তানার মধ্যখানে নরবু একটা হালকা গ্রামোফোন বসিয়েছে। একটি খাম্বা যুবক তাতে তিব্বত-হিমালয়ের মিশ্রিত সংগীতের ভারতীয় রেকর্ড বাজাচ্ছে। শ্রোতারা আনন্দে অধীর হয়ে খচ্চরের পিঠে চাপড় দিয়ে তাল দিচ্ছে। প্রাণ খুলে তারা হাসছে, এবং পান করছে তাদের প্রিয় পানীয় বড় বড় মাটির জালা থেকে।

জোয়ান খাম্বা সেনারা স্তূপ-করা রুটির ট্রে নিয়ে সকলকে দিচ্ছে। সকলে তা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। মনে হল, প্রত্যেকেই যেন এক সপ্তাহের মত খাদ্য নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী জমা করে রাখছে।

বনের গহনে লুকিয়ে ছিল যে-সব মেয়েরা, তারাও বেরিয়ে এসেছে আজ। উজ্জ্বল জাতীয় পোশাকে সজ্জিত মেয়েদের দেখতে অপূর্ব লাগছিল। চীনাদের অত্যাচারের লাঞ্ছনার চিহ্ন এখন যেন মুছে গিয়েছে। এই উৎসবে তাদের উৎসাহের অন্ত নেই। সাহসী খাম্বা যুবকদের প্রতি তাদের সস্নেহ প্রীতি জানানোর জন্যে তারা তাদের জিভ দেখাতে লাগল।

তিব্বতের সব উৎসবই ধর্মীয়ভাবে হয়ে থাকে। স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে দলাই লামার প্রতি প্রীতিও বেশ মেশানো। যে নৃত্যনাট্য অভিনীত হবে তাতে যোগ দেবার জন্যে শক্তসমর্থ সন্ন্যাসীরাও এসে গিয়েছেন। তাঁদের চেহারা কুস্তিগীরের মত মস্ত বড়। আমার খাম্বা-পথপ্রদর্শক বলল যে, পাহাড়ের মত ভীষণ ওই লামারা দলাই লামার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর কাজ করেন।

পর্বতের তুল্য ওই মানুষেরা যখন রঙ্গমঞ্চে উঠলেন তখন মাটি যেন কেঁপে উঠল। রাজা ল্যাং দরমার বিবরণ-সম্বলিত নাটক আরম্ভ হল। আমি কখনো ভাবিনি যে তিব্বতের একটি নগণ্য গ্রামে এমন সুন্দরভাবে নাট্যাভিনয় হতে পারে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবম শতকে ল্যাং দরমা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধদের মস্ত একজন উৎপীড়ক ছিলেন। আমি আশা করেছিলাম, এই ল্যাং দরমা বুঝি রবীন্দ্রনাট্যের সেই অজাতশত্রুর মত হবেন। এদিক থেকে আমি হতাশ হলাম। এই অত্যাচারীর সাজ ছিল চীনা কম্যুনিস্টদের এক সেনাপতির মতন। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ওই অত্যাচারীকে যেন চিনতে পারল—সে হচ্ছে একজন জবরদস্ত চীনা জেনারেল, যে বর্তমানকালের সবচেয়ে বড় একজন অত্যাচারী। স্টেজের উপরে ওই জেনারেল কিষাণদের জমি থেকে তাড়াচ্ছে, বুদ্ধের মূর্তি টেনে নামাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থে আগুন দিচ্ছে, মেয়েদের লুণ্ঠন করছে, স্বদেশবাসীদের বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে, এবং তাদের টেনে নিয়ে চলেছে গরু-ভেড়ার মত চীনদেশে। এই সব দৃশ্য দেখে সকলের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সমস্ত সরাইখানা ও চুম্বি-উপত্যকাটি ভীষণ চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল, 'টা খো সেশোগ, টা খো সেশোগ,' অর্থাৎ, ওকে হত্যা কর, ওকে হত্যা কর।

একটা বিশাল তরবারি ওই বৃহদাকার লামার হাতে দেওয়া হল। খাপ থেকে সেটা বের করে তিনি আক্রমণ করলেন চীনা জেনারেলকে,

অর্থাৎ স্টেজের ল্যাং দরমা রাজাকে। তাকে স্টেজের উপর ধরাশায়ী করলেন, তার বুকের উপর দিয়ে লাফিয়ে গেলেন। বোঝা গেল, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

নাটকের এইটেই শেষ দৃশ্য। উৎসবেরও শেষ অধ্যায়। তারা যখন আনন্দধ্বনি করছে, ভুতুড়ে মুখোশ পরে তাদের সঙ্গী অন্যান্য জীবদের ভয় দেখাচ্ছে, আমি তখন ফিরে এলাম আমার গুহায়।

আমার জন্যে নিমা সেখানে অপেক্ষা করছিল। দরিদ্র এক কৃষকবধূর সাজ পরে আছে সে। তাকে খুব মলিন ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, চোখেমুখে ঝুলে পড়েছে চুল। তার সম্মুখে এক টুকরো রুটি পড়ে আছে, আর এক-জাগ জল। দেখে মনে হল সে কিছু মুখে দেয়নি। তার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম গভীর দুশ্চিন্তায় সে মগ্ন, এবং বাঁচার সাধ তার প্রবল।

"তিব্বত যে মরে গিয়েছে—চীনাদের এই দম্ভ খর্ব করতে হবে।" একটি খাম্বা যুবক তাকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগল, "আমরা হটব না। কিছুতে না। আমরা ছাড়ব না। তোমার মুখে আবার হাসি ফুটবে।"

"কখনো না।"

"চীনারা আমাদের দেশ দখল করার পরে আমাদের অনেক দুর্দশা আর অনেক কষ্ট গিয়েছে। এ অবস্থার বদল হবেই। হতে বাধ্য। তুমি আবার সুখী হবে।"

"কি করে আমরা বাঁচব! কোনো পথ দেখিনে।"

"পথ আছে। আমরা সফল হবই।" দোরজে গুহায় পৌঁছেই বলল, "দার্জিলিঙের কনভেণ্টে আমি যখন যাই তখন আমি শিশু। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা করে আমাদের ক্লাস বসত। ওই ছবি আমার মনে গেঁথে আছে। শিশু-ক্রোড়ে ম্যাডোনারও একটা ছবি ছিল। তিব্বতে চীনারা শিশুসহ ম্যাডোনাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে।

তোমার শিশুসহ কাণ্ডো ক্রুশবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে। এতে মানব-জাতির বিবেক ব্যথিত হবে এবং তদ্দারা চীনাদের হাত থেকে তিব্বত মুক্ত হবেই।"

নিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যুবকটি বলল, "আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার এখন সময় হয়েছে।"

দোরজে জোরের সঙ্গে বলল, "নিশ্চয়। একজন জোয়ান অব আর্ক ইউরোপের ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছে।. কাণ্ডোর মৃত্যুও এশিয়ার ইতিহাস বদলাবে। কিন্তু তফাতটা হচ্ছে এই—বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা অপরাধ করে হয়তো তা বুঝত, কিন্তু এই সব চীনাদের সে-সব মনুষ্যজনোচিত বোধের বালাই নেই।"

চটপট পরামর্শের জন্যে একদল খাম্বা যুবক গুহায় এসে জড়ো হল। তাদের বেশির ভাগই জাতীয় পোশাকে সজ্জিত। কিন্তু কয়েকজনের পরনে পুরনো বৃটিশ পোশাক, আর হাতে আমাদের সেনাদেরই মত হালকা অস্ত্রশস্ত্র। মনে হল, এই সব তারা সম্প্রতি গোপনে আমদানি করছে।

দোরজে তাদের নির্দেশ দেওয়া শেষ করে নিমার দিকে তাকাল, বলল, "যখন আমাদের মনে গভীরতম বেদনা পুঞ্জীভূত হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করা। কার্রগিউ গুম্ফার পুরোহিতের কথা জান, তিনি যুদ্ধরত খাম্বাদের জন্যে প্রার্থনা করেছেন। তোমার উচিত তাঁর কাছে যাওয়া। আমরা যে নতুন সংগ্রামের সম্মুখীন হব, সেই সংগ্রামের জন্যে তোমাকে পরিচালনা করতে এবং তোমার মনে বল সঞ্চার করতে তিনি পারবেন।"

রাত্রিবেলা খাম্বা যোদ্ধারা অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। চুম্বিথঙের সরাই এখন পূর্ণজ্যোৎস্নায় যেন স্নান করছে। আমরা সেই তুষারাচ্ছন্ন সরাইখানা পার হয়ে গেলাম। নিমার যেন মনে হল, কিছু সে চিরদিনের

মত হারাচ্ছে। চাপা গলায় সে বলল, "কোন্ পাপে তারা হত্যা করল আমার—"

এর কোনো জবাব নেই।

৩ কারগিউ গুম্ফা

দূরে তিব্বতী ল্যাণ্ডস্কেপ। প্রার্থনা-দণ্ডগুলি তার মধ্যে কালো কালো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে মন্দিরের আকারের স্তূপ—তিব্বতী ভাষায় যাকে বলে চোরতেন। প্রকৃতির উপরে মানুষের এই কারুকাজ দেখেই বোঝা যায়, মানুষের জীবনধারণ করার জন্যে কি রকম কল্পনা আছে। এইজন্যে, যাকে মানুষ ধর্ম বলে, সেই ধর্মই মানুষের বাঁচার পক্ষে একটা অত্যাবশ্যক জিনিস।

ঢালু পথে নামার সময়ে প্রথম যে চোরতেনটি আমাদের চোখে পড়ল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সেটি স্বপ্নময় বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওটি যেন প্রকাণ্ড একটি ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি। ওর চার পাশে ঘুরছিলেন একজন লামা, তাঁর হাতে প্রার্থনাচক্র। আমার পায়ের শব্দে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি কারগিউ গুম্ফায় চলেছ?"

আমাদের মধ্যের কয়েকজন একসঙ্গে মাথা নাড়ল; লামা যেন একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "তোমরা বোধহয় জান না, ওই গুম্ফাটিকে চীনারা সেনাবাস করেছে।"

"আমরা জানিনে।"

"না জানারই কথা। মাত্র কাল বিকেলে এ ঘটনা ঘটেছে।"

"কি হয়েছে বলুন।"

"তোমরা সকলেই জান, সর্বপ্রকার জাতীয় আনন্দ ও ধর্মীয় নৃত্য বেআইনী করা হয়েছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল, লামারা ওই উপলক্ষে

নানা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এবং সন্ন্যাসীরা মিলিত হয়ে সেই উৎসবে রত হন। সারা আমচু উপত্যকা উৎসব-নিনাদে মুখরিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ একদল চীনা সেনা এসে উপস্থিত হল। শুয়োরের মত মুখওলা একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করল, 'কার সম্মানে তোমাদের এত উল্লাস?' উত্তর হল, 'ভগবান বুদ্ধ ও দলাই লামা।' অফিসারটি লামার গালে এক চড় দিয়ে বলল, 'মূর্খ, জান না সর্বত্র আমরা বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করেছি, আর দলাই লামা দেশদ্রোহী হয়েছে?' এই কথা বলে লোকটা বেদীর কাছে গিয়ে সব তছনছ করে দিয়ে বেদীর উপর পা তুলে দিয়ে ধূমপান করল, মদ্যপান করল, এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল।"

"কি লজ্জার কথা।"

"ওই শেষ নয়। এই বিখ্যাত গুম্ফায় যুগ যুগ ধরে যে-সব অমূল্য পোশাকাদি বাদ্যযন্ত্র ও মুখোশ সংগ্রহ করা হয়েছে, সে সেগুলি নষ্ট করল। এক-একটি অমূল্য জিনিস নষ্ট হচ্ছে, আর পৈশাচিক উল্লাসে সে হেসে উঠেছে।"

উপত্যকা থেকে ভোরের কুয়াশা সরে গেল। জেগে উঠল অসংখ্য গিরিশিখর, আমচু নদীতে তাদের ছায়া পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওখানে যাঁরা বাস করতেন, সেই হাজার হাজার লামাদের কি গতি হল?"

"সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। রাস্তা তৈরির কাজে নিয়োগ করা হল তাঁদের। যাঁরা ও-কাজ করতে অস্বীকার করলেন তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইয়াটুংএ—প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হবে।"

নিমা জিজ্ঞাসা করল, "টুলকু রিমপোচের কোনো খবর জান?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ। চীনারা যখন হানা দিল, সে তখন এখানে ছিল না। ভূটানের সীমান্তে ওই গ্রাম দেখছ না? তার কয়েকজন ভক্ত পূর্ণিমা-উৎসবের জন্যে তাকে ওখানে ডেকে নিয়ে যায়।"

আমরা চীনাদের চোখে যাতে না পড়ি, এইজন্যে গাছগাছড়ার আড়াল দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত পার হয়ে চললাম এবং দূরের ওই গ্রামের দিকে চললাম। ঠিক তুষারসীমার ওপারে পাহাড়ের উপরে গ্রামটি বসানো।

শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে রিমপোচে তখন ধ্যানমগ্ন। আমাদের দেখে ইঙ্গিতে তিনি আশীর্বাদ করলেন। আমরা বসলাম।

নিমা তার সমস্যার কথা তুলল, "যা আমি হারিয়েছি তা যদি কিছু পাই, আমি তবে প্রার্থনা করব। তা না হলে আমি পরিত্যাগ করব এ পৃথিবী।"

"কাকে তুমি অনুযোগ করছ ?"

"সমস্ত বৌদ্ধধর্মকে।"

"কেন ? করুণাঘন বুদ্ধ কি তোমার সন্তান হরণ করেছেন ?"

"না। তিনি না।"

"তোমাকে কেউ বিষাক্ত বাণ মেরে রক্তাক্ত করল। ডাক্তার এল। তখন ডাক্তারকে বলা হল আমার এই রক্তমাখা জামাকাপড় আগে আগের মত করে দাও, তবে তুলতে দেব বাণ। তোমার কথাও যে তেমনি।"

"না, প্রভু, না।"

"তাহলে আগে বাণ তুলে, চিকিৎসা করে আরাম করা, তারপরে সাজ বদলানো দরকার না ?"

"তাই।"

"ভগবান বুদ্ধ আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। সর্বপ্রকার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ তিনি বলে দিয়েছেন।"

"আমার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হবে কি ভাবে ?"

"সেজন্যে বৌদ্ধধর্মের আরো গভীরে তোমাকে যেতে হবে। যারা

ধর্মের নামে ব্যঙ্গ করে সেই কমিউনিস্টদের কথায় ভুলো না। ·এই ধর্ম হচ্ছে সাহসীর ধর্ম। শত্রুর আঘাতের কাছে নতি স্বীকার না করাই এই ধর্মের মূল কথা। জয়ী না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করাই এই ধর্মের কথা।"

"তোমার কথায় আমি প্রেরণা পাই। আজ ওই শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু পড়ে আমাকে শোনাবে ?"

"সব রকম মানসিক গ্লানির হাত থেকে মুক্তির উপায় ভগবান তথাগত বলে গিয়েছেন। আমি আজ মহাবগ্‌গ থেকে তোমাকে পড়ে শোনাব। তোমার মত অবস্থায় পড়লে কি করতে হয়, তা ওতে বলা আছে।"

আমরা তাঁকে সহজভাবে সে কথা বলার জন্যে অনুরোধ করতে তিনি বললেন :

"কাশীর পরাক্রমশালী নৃপতি ব্রহ্মদত্ত কোশলের রাজা দিরঘতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেন। আমাদের দলাই লামার মত দিরঘতি দেশত্যাগ করেন। নানা দেশ ঘুরে অবশেষে বারাণসীতে এসে তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। তিনি তাঁর পুত্র দীর্ঘায়ুকে নানা অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করেন যাতে সে ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে—রাজা ধরা পড়েন এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মশানে। তাঁর মাথার উপর যখন খড়্গ তোলা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, 'ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা জয় করা যায় না।' পিতার নির্দেশিত পণ করে দীর্ঘায়ু হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারে। ঠিক সেই ভাবেই দলাই লামাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হলে তিব্বতও একদিন মুক্ত হবে।"

রৌদ্রের তাপ বেশ আরামদায়ক হওয়ায় আমরা লামাকে আরও কিছু পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলাম। তার উত্তরে তিনি পড়লেন এবং তার ব্যাখ্যা করে বললেন, "নিমা আজ আমাকে কিসা গোতমীর

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্রাবস্তীর দারিদ্র্যপীড়িত এক গৃহে কিসার জন্ম। যথাকালে তার বিবাহ হয়, এবং একটি পুত্র হয়। কিন্তু ছেলেটি মারা যায় অচিরেই। এতে গোতমী দুঃসহ আঘাত পেলেন। বুকে মৃতসন্তান নিয়ে তিনি 'আমার পুত্র ফিরিয়ে দাও' বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। লোকে তাঁকে পাগল মনে করল। অবশেষে গোতমী ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে ওই আবেদন জানাতে বুদ্ধ বললেন, 'তুমি এই সারা শহরটি ঘুরে দেখ, এবং যে গৃহে কেউ কখনো মারা যায়নি, সেই গৃহ থেকে একটি সরষের দানা নিয়ে এস।' কিন্তু তেমন গৃহ গোতমী পেলেন না। আমাদের নিমার অবস্থাও অনুরূপ। সারা তিব্বত ঘুরে যদি দেখে নিমা, দেখবে—এমন ঘর নেই যেখানে চীনারা অনুরূপ অত্যাচার না করেছে।"

লামার বাণীতে বুঝি একটু কাজ হল। সে নিজের দুঃখ ভুলে উঠে গিয়ে ফুল তুলে এনে ভগবান তথাগতকে অর্ঘ দিল।

টুলকু রিমপোচেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই দুঃসময়ে তিব্বতের লোকদের প্রতি আপনার উপদেশ কি?"

রিমপোচে বললেন, "তথাগত যা বলে গিয়েছেন তাই—নিজের পথপ্রদর্শক নিজে হও। নিজের উপর নির্ভর করো। বাইরের শক্তির উপর ভরসা রেখো না।"

তিব্বতে আসার আগে আমার ধারণা ছিল যে লামারা অলস এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁরা দায়স্বরূপ। কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে এসে ধারণা বদলে গেল, এবং তাঁদের উপর অগাধ শ্রদ্ধা হল। টুলকু রিমপোচেকে দেখে আমার মনে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর কথা। তাঁর কাছে এসে মনে হল যেন, গান্ধীজীর আশ্রমেই এসেছি আমি—যেখান থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত নির্দেশ দান করা হচ্ছে।

সূর্য অস্ত যেতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। দিনের

আলোয় যারা চীনাদের ভয়ে বেরতে পারেনি, এখন তারা দলে-দলে আসতে লাগল এখানে পরামর্শের জন্যে। এখানেই চীনাদের বাধা-দানের যাবতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। ভূটান-সীমান্তে যারা নিযুক্ত ছিল, তারাই প্রথমে তথ্য জানাল।

একজন বুড়ো রাখাল বলল, "সম্প্রতি ভূটান থেকে এক খচ্চর বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। এটা আমাদের পক্ষে কুলক্ষণ।"

একজন দোকানদার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, "আমি তাদের ফিরে যেতে বলেছি। ইয়াটুং-এর বাজারে ওরা চাল নিয়ে আসছিল। যে-সব চীনাদের রসদ কম পড়েছে, ওর দ্বারা তাদের সুবিধে হয়ে যাবে—এটা সহজেই বুঝতে পারা গেল। আমি তাদের কাছে চাল কিনতে চেয়েছিলাম, তিন শ' টাকা মন হিসেবে তারা দর দিল—ওই দামে ইয়াটুং-এ চীনারা কেনে। অত দাম আমরা কি করে দিই? আমি তাদের বললাম, চীনারা অত দাম দিতে পারে, কেননা তিব্বতীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করেই তারা দাম দেয়। কিন্তু ওসব তত্ত্বে ভূটানী বণিকদের কোনো দরকার নেই। চীনাদের দর তাদের কাছে লোভনীয়।"

একজন খাম্বা অফিসার বললেন, "কিন্তু ভূটানীদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারিনে। তারা আমাদের বন্ধু, আমাদের প্রতিবেশী। আমরা কেবল ওই সরবরাহের লাইনটা কেটে দিতে পারি। ওদিকটা আমাদেরই তাঁবে। একবার ওখান থেকে আমাদের হঠাতে পারলেই ভূটান সিকিম ও ভারতের সঙ্গে চীনাদের সরাসরি যোগ হয়ে যাবে। তার ফলে আমাদের পালাবার পথও হবে বন্ধ। এইজন্যে আমরা ভূটানী ব্যবসায়ীদের সাবধান করে দিতে পারি মাত্র যে, তারা ইয়াটুং-এ মাল নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আমাদের বাহিনী সে-সব বাজেয়াপ্ত করবে। আমি আমাদের গেরিলা বাহিনীকে এই নির্দেশই দেব।"

এর পরেই কিরগিউ গুম্ফা এলাকার শিশু ও নারীদের চীনা কর্তৃক গ্রেপ্তারের বিষয় আলোচনা হল। এই বিষয়টি উত্থাপন করলেন সেই

ভিখারী লামাটি—সকালে যাঁকে দেখেছি। এঁকে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মনে করেছিলাম, টুলকু রিমপোচে বললেন, "ইনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি আমাদের গোয়েন্দা।"

চীনাদের মতলব ছিল কিরগিউ গুম্ফা দখল করে এটাকে সেনা-নিবাস করা, এবং দলাই লামাকে খুঁজে বের করা। তারা হতাশ হল। তারা এখানে ঘাটি করে সব রাস্তা বন্ধ করার মতলব অনুযায়ী কাজ করতে পারল না। কোনো শক্তসমর্থ পুরুষকেও তারা ধরতে পারল না। তার বদলে আশপাশের গ্রাম থেকে প্রায় দুই শ' মেয়ে ও শিশুকে তারা গ্রেপ্তার করল। খবর পাওয়া গিয়েছে যে, গিয়াংসি ও ফারির মাঝামাঝি জায়গায় বড় রকমের সংঘর্ষ বেধেছে। এবং চীনাদের বেশ ক্ষতি হয়েছে। এই কারণে চীনারা অন্য দিকে ফিরেছে। কিরগিউ ছেড়ে তারা ইয়াটুং-এ গিয়ে জমায়েত হয়েছে। কিরগিউ থেকে তারা যখন দুই শ' মেয়ে ও শিশু নিয়ে রওনা হয়, তখন তিব্বতী বাহিনীর আচমকা আক্রমণে রিনচেনগঞ্জের কাছে তারা পরাস্তই হত ; কিন্তু চীনারা আগে থেকেই এই আক্রমণ আন্দাজ করতে পারে। এইজন্যে অপহৃত শিশু ও নারীদের উদ্ধার করা গেল না। কিন্তু চীনারা পর্যুদস্ত হয়েছে, অনেক সেনাকে গভীর খাদে ফেলে দেওয়াও হয়েছে। চীনা টহলদাররা নেই জানা মাত্র পুনরায় তিব্বতী বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে মেয়ে ও শিশুদের উদ্ধার করবে।

ভিখারী লামার কাছ থেকে এই বিবরণ পেয়ে বোঝা গেল যে, সারা তিব্বতে এই যুদ্ধ জাতীয় সংগ্রামরূপে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের দেশের মঠ-মন্দির ধ্বংস হয়েছে বলে তিব্বতীরা মর্মাহত, কিন্তু তাদের দেশের নারী ও শিশুদের লাঞ্ছনায় তাদের শরীরে রক্ত আগুন হয়ে উঠেছে।

সব বৃত্তান্ত শুনে টুলকু রিমপোচে বললেন, "আমার যা বয়স এতে চীনা আক্রমণকারীদের তাড়াবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু এই হচ্ছে

সুযোগ—আমার মৃত্যুবরণের, বৌদ্ধ পন্থায়। বহুদিন আমি বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছি যে দলাই লামার নেতৃত্বে চালিত সংগ্রামে আমি যেন মরতে পারি। সেই সুযোগ এসেছে। তিব্বতে এর চেয়ে গৌরবের মৃত্যু আর নেই।"

যে-সব খাম্বাদের আবার নিজেদের ঘাটিতে ফিরে যেতে হবে তারা কিঞ্চিৎ আহার করে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ল। কেবল টুলকু রিমপোচে বসে রইলেন তাঁর প্রার্থনা-বেদীতে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "চীনাদের সঙ্গে সংগ্রামে যেখানে নরহত্যা হচ্ছে, লামারা কি তাতে যোগ দেন?"

"নিশ্চয়। অনেক ক্ষেত্রে মঠাধ্যক্ষই প্রথম গুলি ছুঁড়েছেন।"

"বুদ্ধের অহিংসার সঙ্গে এই কাজের সামঞ্জস্য কোথায়?"

"হত্যা করা এবং হত্যা না-করা—বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনে এ দুয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।"

"আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, যখন ভারতে বিদেশী আক্রমণ ঘটেছে, তখন তাদের কাছে পরাজয়ের মূলে বৌদ্ধধর্ম। কেননা ওই ধর্ম সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেয়নি।"

"তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা কাপুরুষতা, সেটা কোনো ধর্মের কাজ নয়। ভগবান বুদ্ধ হত্যা করা না-করা সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বলেছেন, মৃত্যুকে জয় করতে। সাহসই আসল কথা। শত্রু যখন তোমাকে আক্রমণ করেছে, তখন তুমি মৃত্যুর নাগপাশে পড়েছ। সে পাশ থেকে তোমাকে মুক্ত হতে হবে। শত্রুকে বিনাশ করে হলেও তোমাকে তাই করতে হবে। এর জন্যে দার্শনিক তত্ত্বকথার দরকার কি।"

রিমপোচে বলতে লাগলেন, "সৃষ্টির মূল যখন বিনাশের মুখে তখন তোমাকে তার প্রতিকার করতে হবে। নারীরাই সৃষ্টির আদ্যাশক্তি।

চীনারা নারী-নির্যাতন ও নারী-নিধনে রত হয়েছে। এই হীন কাজ রোধ করতে হবে। তিব্বতীরা চীনাদের এই অপকর্ম কখনো বরদাস্ত করবে না। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি—ঘোর যুদ্ধ হবে, এবং জয় হবে শেষ পর্যন্ত তিব্বতের।"

"আমরা ভারতবাসী। আমাদের চেয়ে সুখী কেউ হবে না—যদি এমন ঘটনা ঘটে।"

"আমাদের মঠে আমরা এখন এই শিক্ষাই দিচ্ছি। চীনারা বুদ্ধকে এবং বুদ্ধের পবিত্র ভূমিকে অপমান করেছে। তার প্রতিবিধান চাই। প্রকৃত বৌদ্ধের এখন কর্তব্য চীনাদের পরাস্ত করা।"

ভিখারী লামা পুনরায় শেষ নির্দেশ নিতে এলেন। যদিও তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, ভিখারী লামার গায়ে তবু শতচ্ছিদ্র কম্বল।

টুলকু রিমপোচেকে বললাম, "ওঁর শীত লাগে না?"

"উনি শপথ নিয়েছেন। চীনাদের উপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সাজ বদল উনি করবেন না।"

টুলকু রিমপোচের ডেরা থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, চাঁদ তখন পাহাড়ের চূড়ার উপর। আমার লক্ষ্য ইয়াটুং কিংবা তারও ওধারে আসল তিব্বতে। সেখানে কি ঘটনা ঘটছে প্রত্যক্ষ দেখতে চাই।

ভিখারী লামাও ওইদিকে যাবেন। চীনাদের ফাঁদ থেকে আমাকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন।—"আমি বহু দূর থেকে ওই নৃশংসদের গন্ধ পাই। এতে নিরাপদ পথ বেছে নিতে পারা যায়।"

চুপচাপ হেঁটে চললাম আমরা। আমচু নদীর কিনার বরাবর আমরা এগুতে লাগলাম। নদীর কল্লোলে আমাদের পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গেল।

ভোরের দিকে আমরা এক বনের মুখে এসে পৌঁছলাম। সেইখানে

নদীটাও একটা তীব্র বাঁক নিয়েছে। আমার সঙ্গীটি কি যেন দেখতে পেয়েছেন, গতি মন্থর করে সাবধানে এগুতে লাগলেন।

জলের কিনার থেকে দুর্গন্ধ ভেসে এল—একটি মৃতদেহের গন্ধ। আমি থেমে গেলাম। লামা এগুতে লাগলেন। মৃতদেহটা তিনি উল্টে দিলেন। তার মুখের দিকে চেয়েই চীৎকার করে উঠলেন, "কাণ্ডো, কাণ্ডো! আমার স্ত্রী।"

নদীর গর্জনেও সে আর্তনাদ চাপা পড়ল না।

অট্টহাস্য করে উঠলেন লামা—বদ্ধ পাগলের মত।

৪। ইয়াটুঙের জানোয়ার

ইয়াটুঙের দিকে আমচুর একটা বাঁক নিয়ে এগুতেই আমার মাথায় একটা মতলব এল। রিনচেনগঙের কাঠের সাঁকোর মুখেই তিব্বতীরা অভয়দানের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বুদ্ধের একটা মূর্তি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করেছে। একজন উৎসাহী গ্রামবাসী ওর ধারেই একটা ছোট দোকান খুলেছে। আমি কিছু খেয়ে নেবার জন্যে এখানে ঢুকলাম।

"এখানে কোনো চীনা ঘাটি আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"বুদ্ধের আশীর্বাদে নেই। তারা এখানে থাকবে কেন? তুমি তিব্বতে আছ, চীনে নেই। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ইয়াটুঙে অবশ্য তারা আছে।"

দোকানদারের বউ বলল, "সেখানে তাদের খাঁদা নাক দেখা যায়। কিন্তু এই এলাকায় তারা নাক গলাতে এলেই আমাদের লোকেরা তাদের কোতল করবে।"

"এখন তোমাদের সেনাঘাটি কি অনেক আছে?"

"বলতে পারি, যদি আগে তোমার পরিচয় পাই।"

বললাম, "টুলকু রিমপোচে আমাকে এদিকে পাঠিয়েছেন।"

"তাহলে তোমাকে তিব্বতের বন্ধু বলে ধরতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে চীনা ছাড়া আর কাউকে আমরা অবিশ্বাস করিনে। তুমি যখন রিমপোচের বন্ধু, তোমার সঙ্গে তাহলে কয়েকটা কাজের কথা বলতে পারি। কিন্তু, এস, প্রথমে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

এই বলে দোকানদারটি তার স্ত্রীকে বলল, "আমাদের কিছু মোমোস (তিব্বতী চাপাটি) ও চা দাও।" লাল টুকটুকে পোশাকে সজ্জিত তার স্ত্রীর পিঠে তার শিশুটি বাঁধা; আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবার তাদের যা রীতি, সেই অনুসারে সে তার জিভ বের করে আমাদের চা পরিবেশন করল।

"আমার স্ত্রী লাসার মেয়ে। চীনারা সেখানকার অনেক মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমার স্ত্রী ভাগ্যক্রমে পালাতে পেরেছে। এখানে আমরা আছি যাযাবরের মত। এই দোকানটা আসলে কিছু না, একটা বাহ্যিক আবরণ।"

কেউ আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছে কি না ভালো করে দেখে নিয়ে সে বলতে লাগল, "আচমকা আক্রমণের মত আমাদের সেনার ঘাটি সম্বন্ধে তুমি জানতে চেয়েছ। জেনে রাখ, লাসা-ইয়াটুং বাণিজ্য-পথের কথা ছেড়ে দাও—চীনা সেনার পাহারায় ওই পথে মাল যাতায়াত করা সত্ত্বেও আমরা অনেকবার তাদের ঘায়েল করেছি। ওই পথটি ছাড়া বাকি তিব্বত আমাদেরই হাতে। বলতে গেলে তিব্বতের তিন ভাগের দু'ভাগে চীনারা এখনো পা দিতে পারেনি। দরকার হলেই মঠ মন্দির দোকান কুটির সব জায়গায় আমাদের ঘাটি তৈরি হয়। লাসার শহুরে মেজাজধারী মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তিব্বতের সকলেই ঘৃণা করে চীনাদের। আক্রমণকারীরা আমাদের অবিশ্বাস করে, আমরা তাদের ঘৃণা করি—সুতরাং এর কোনো আপোস নেই। শেষ পর্যন্ত চীনদের এ-দেশ ছাড়তে হবে।"

তার স্ত্রী আমাদের পাত্রে আরো চা ঢেলে দিল; দোকানদারটি বলতে লাগল, "তোমার দেশের লোক যদি চীনাদের কোন সাহায্য না করে তাহলে ইয়াটুং-লাসা সড়ক থেকেও চীনাদের হঠতে হবে।"

বললাম, "আমার দেশবাসী তাদের সাহায্য করবে কেন?"

"বিস্তর রসদের চোরা চালান চলছে; উঁচু দামে চীনারা কিনছে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—ইয়াটুঙে গিয়ে তুমি এই কারবারটা বন্ধ করো—যে-সময়টা আমাদের এই জীবনমরণ সমস্যা, সেই সময়টায় অন্তত যেন ও-কারবার না চলে। ইয়াটুঙের বণিকেরা যদি মাল সরবরাহ না করে তাহলে চীনারা লাসাস্থ তাদের মূল ঘাটির সঙ্গে যোগসূত্র হারাবে এবং ভূটান সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দলাই লামাকে পাকড়াও করার শক্তি তাদের থাকবে না। কাজটা বড়ই জরুরি। এই কাজটা সেরে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো—আমি তোমাকে তিব্বতের যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যাব, তীর্থের জন্যে হোক, দৃশ্য দেখার জন্য হোক, কাজের জন্যে হোক—যে কারণেই হোক না কেন।"

মেঝের উপর তিব্বতের একটি ম্যাপ মেলে নিয়ে আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে তা দেখতে লাগলাম। দোকানদারটি বলল, "ইয়াটুঙে যাওয়ার জন্যে ম্যাপ দেখার দরকার নেই। ওই সাঁকোর ওপারে মাইলখানেক গেলেই একটা রক্তবর্ণের ফটক পাবে, সেই পথেই ইয়াটুং। তুমি ভারতীয়, তোমার ছাড়পত্র আছে—চীনারা তোমাকে বাধা দেবে না।"

ছাড়পত্রটি বের করে ভালো করে সেটা পড়লাম। ১৯৫৪ সালের ভারত-চীন চুক্তি অনুযায়ী আমি এই ছাড়পত্র নিয়ে ইয়াটুং ও ফারি পার হয়ে গিয়াংসে পর্যন্ত যেতে পারি।

আমি ইয়াটুঙের দিকে যাত্রা করলাম।

আমচুর খাড়া উঁচু পাড় বরাবর এবড়োখেবড়ো রাস্তা গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন শত্রুর শিবিরের পিছন দিকে চলেছি। মনটা বড় গুমট ঠেকছিল।

ফটকের মুখ থেকে স্বয়ংচালিত বন্দুকধারী দু'জন চীনা সেনা আমাকে তাদের আপিসে নিয়ে গেল। আমার ছাড়পত্রটি উল্টে ধরে তারা সেটা পড়ার চেষ্টা করল, এবং আমার উপরে তাদের খবরদারী করার ক্ষমতা যে আছে তা জাহির করতে লাগল। তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ভারতীয় দোকানী ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি আফিসে গিয়ে জানাও।"

মাইল-খানেক হেঁটে পথের দু'ধারে কাঠের বাড়ি দেখলাম। এই সেই ইয়াটুং শহরতলী—ভারতীয় সীমান্ত-সমস্যায় ও তিব্বতের ইতিহাসে যার এত হাঁকডাক।

বিকেল প্রায় চারটে। কিন্তু উঁচু পাহাড়ের ওপারে সূর্য আড়াল পড়ে গিয়েছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। জনমনুষ্য দেখছি নে। শীতে দাঁত ঠকঠক করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বুঝি সব পালিয়েছে।

একটু এগুতেই শুনতে পেলাম, একটা লাউডস্পীকার থেকে অদ্ভুত শব্দের কথা বের হচ্ছে। অবশেষে দেখলাম, আমি একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠে দাঁড়িয়ে। বেঁটে একজন লামা শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা পরে আমার দিকে তাকাচ্ছে, পাশের গলি থেকে একটা দরিদ্র লোক আমাকে দেখছে। অকস্মাৎ চেঙ্গিস খাঁ-র মত ভীষণ মুখের একটা চীনা স্টাইলের তিব্বতী এসে আমাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার পাস ?"

আমার ছাড়পত্রটি তাকে দিলাম। সে সেটা তার বুকপকেটে রাখল। তারপর ওই লামা ও দরিদ্র লোকটিকে তেড়ে গিয়ে তাদের উত্তমমধ্যম প্রহার করল, এবং তাদের ধাক্কা দিতে দিতে আমচু নদীর ঢালুর দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি তার পিছন-পিছন চললাম। তখনই একজন ভারতীয় ওদিকের কোণের দোকান থেকে চীৎকার করে বলল, "তুমি কি পাগল হয়েছ ?"

তাকে আমি আমার পরিচয় দিলাম। সে আমাকে তার দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল, আগুনের ধারে নিয়ে গিয়ে বলল, "ওই যে ঢালু পথ, ওই পথে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়।"

"কি জন্যে তারা এমন করে ?"

"দলাই লামা কোথায়, প্রতিরোধবাহিনী কোথায়—তা তারা জানতে চায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি ওদের কি দশা হল জানতে পারবে। চীনাদের নগরপাল নিজে এসে ওদের দাওয়াই দেবে। ওই নগরপালকে লোকে বলে জানোয়ার।"

লোকটা খবরের কাগজে আমার নাম দেখেছে, এইজন্যে খোলাখুলি-ভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বলল, "এখানকার জীবন চীনা কমিউনিস্টদের শাসনে দুর্বিষহ হয়েছে। আমার মালপত্র বাঁধাছাঁদা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ—কালই আমি ভারতে যাত্রা করছি।"

"কেন ?"

"যে বুদ্ধকে আমরা প্রত্যহ প্রতি পদে পূজা করি, তাঁকে তারা করে অসম্মান। আগে মঠাধ্যক্ষই ছিলেন সর্বজনপূজ্য। এখন তা হচ্ছে মাও। এইজন্যে মঠের চেয়েও উঁচু করে ওরা বানিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির আপিস।"

"তিব্বত ছাড়ার এই একটিমাত্র কারণ হতে পারে না।"

"দেখ, গত বছর থেকে ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি তো গিয়েছেই, ব্যবসায়ও এখন দাঁড়িয়েছে প্রতারণায়।"

"ব্যবসায়ে প্রতারণা, কথাটার মানে কি ?"

"এখান থেকে চীনা এজেন্টরা হাজার হাজার রৌপ্য ডলার ভারতের কালিম্পঙে চালান দেয়। ওই ডলার টাকায় পরিণত করা হয়। শোনা

যায় ভারতের একটি পার্টি বাট্টা হিসেবে শতকরা দশ টাকা পায়। ভারতে গোয়েন্দাগিরি সাবোতাজ প্রচার ইত্যাদির জন্য ওই হল তাদের মজুরি। বাকি টাকা দিয়ে তারা এমন-সব মাল কেনে, চীনের পক্ষে যা কেনা কঠিন, বা চীন থেকে তিব্বতে নিয়ে আসা যা দুঃসাধ্য। এইভাবে চীনারা আমাদের দেশের বন্ধুত্ব, নিরপেক্ষতা ও সুনাম নষ্ট করছে। সম্প্রতি তারা নাকি কিছু বিস্ফোরক এইভাবে এনেছে, সিকিম পর্যন্ত একটা সেনা চলাচলের রাস্তা বানাচ্ছে ওই দিয়ে। লামাদের ধরে রাস্তা তৈরির কাজে লাগাচ্ছে। এইসব কারণে আমি তিব্বত ছাড়ছি।"

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। কোনো চা-খানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থার জন্যে উদ্যোগ করতে যাচ্ছিলাম। দোকানী আমাকে বাধা দিয়ে বলল, "সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বাইরে বেরনো নিষেধ। সাবধান না করেই গুলি করা হয়ে থাকে। তার চেয়ে এখানেই শুয়ে পড়। দুপুরে আমি যা রেঁধেছি তাই ভাগ করে খাব।"

এক টুকরো রুটি হাতে নিয়েছি, অমনি ভীষণভাবে আর্তনাদ কানে এল।

"ওই হতভাগ্য দুটিকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। দরিদ্রদের রক্ষা করার জন্যেই তাদের এখানে আগমন—পিকিং এই রকম দাবি করছে না? ওই ভাবে রক্ষা করছে তারা তিব্বতী দরিদ্রদের। ওই দুর্বল লোকদের কাছ থেকে কোনো সামরিক তথ্যও যখন পাওয়া যাবে না, ওরা যখন রাস্তা বানানোর মত মেহনতি কাজেরও যোগ্য নয়, তখন পাথরচাপা দিয়ে ওদের পিষে ফেলাই ভালো বলে ওরা মনে করেছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি থেকে কি গুলি করে মারা ভালো না? কিন্তু এভাবে ওরা গুলি খরচ করতে চায় না—ও জিনিসের ওদের বড় টানাটানি। খাম্বা যোদ্ধাদের কাছে পেলে তাদের উপর ব্যবহারের জন্যে সে-সব মজুত রাখতে চায়।"

ক্রমে ক্রমে আর্তনাদ কমতে লাগল। তারপর সব ঠাণ্ডা। কাল হয়তো ওই দেহ দুটি আমচুর জলে ভাসবে।

চারদিকের অন্ধকার এতই গাঢ় যে, তিব্বতকে পদানত রাখার জন্যে চীনারা কি রকম অত্যাচার করছে বাইরের জগৎ তা জানতেই পারবে না। আমার মন মুষড়ে পড়তে লাগল ; আমার বন্ধুটি বলল, "কিছুই তুমি দেখনি। চীনা প্রাচীরের মত চীনা সেনাদের দুর্গ হচ্ছে পাইকারীভাবে লামাদের ও ধৃত খাম্বাদের উৎপীড়নের কারখানা। হিটলার ইহুদীদের উপর যে জুলুম করেছে, চীনাদের এই নির্দয়তার কাছে তা কিছু না।"

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বড় অশান্তি নিয়ে। ওই দুর্বৃত্তটা আমার ছাড়পত্র নিয়েছে, সেজন্যে উদ্বিগ্ন হলাম। ওইটি হাতছাড়া হওয়ায় আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম। দখলদার চীনা সেনাদের কাছে আমার দশা কি হবে ভাবতে লাগলাম।

আমার বন্ধুটি আমাকে সাহস দিল এবং সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই দুর্বৃত্তটার বিষয় বলতে লাগল, "বরাবরই ও ওই রকম। ব্রিটিশ যখন এখানে ছিল তখন তাদের হয়ে অনেক হীন কাজ করেছে ও রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছে। যখন চীনারা এল তখন সাদা ওড়না উড়িয়ে জেনারেল ট্যাং কোয়ান সানের উদ্দেশে অভ্যর্থনা জানাল। তার পুরস্কার স্বরূপ চীনারা ওকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রক ও বন্দীদের প্রশ্নকর্তা করে দিল। লোকটা নরমের যম। সে যদি জানে তুমি কড়া লোক তাহলে তোমার ক্ষতি করতে ভয় পাবে। এমনকি তোমার যুক্তিসংগত অনুরোধও রক্ষা করবে। এখানে ট্রেড-এজেন্সিতে আমার এক বন্ধু কাজ করে, এ ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে দেখা করব। চললাম।"

একা একা বসে আমি ভীতসন্ত্রস্ত ভারতীয়দের যেতে দেখলাম ওই পথ দিয়ে। এর সঙ্গে আমি ভারতবর্ষের চীনাদের অবস্থার বিষয় তুলনা করে

দেখতে লাগলাম। সেখানে তারা স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় বিচরণ করছে। কিন্তু এখানে ভারতীয়দের গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে ভীতত্রস্ত রাখা হয়েছে।

আমার বন্ধুটি ফিরে এসে আমাকে যেতে বলল ওই তিব্বতীটির কুঠিতে। আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, "তার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ো না। একবার ওই ফাঁসে পা দিলে কথার প্যাঁচে তোমাকে এমন করবে যে তোমারও প্রাণ যাবে, আমার দেশেরও মান থাকবে না।"

তার কুঠিটা দু' মিনিটের রাস্তা। সেখানে তখন বেশ একটা গণ্ডগোল চলেছে। গিয়ে দেখি, একটি যুবতী মেয়েকে ওই জংলীটা হাত ধরে টেনে বলছে, "আমি প্রমাণ করব যে তুমি সিকিমী নও, তুমি তিব্বতী।"

মেয়েটির মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। তার থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে সে বন্দী। তার মুখে কালশিরে পড়া—নির্যাতনের চিহ্ন। ক্ষীণ গলায় সে প্রতিবাদ করে বলছে, "নাতুলা গিরিপথের ওপারে আমি থাকি। কোনো ছাড়পত্র না নিয়েই বরাবরই আমরা কিরগিউ গুম্ফায় তীর্থ করতে আসি। মাত্র কালকে যে-সব চীনা সেনা ওই গুম্ফা ঘেরাও করে তারা আমাকে ধরেছে। আমি নির্দোষ। ভগবানের দোহাই, আমাকে কৃপা কর।"

তার গলার স্বরে একটা অদ্ভুত কোমলতা ছিল, আমার মনে হল আমি যেন তাকে চিনি। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে তাকে চিনতে পারলাম। সে পেমা।

তার উপর অনেক প্রকার নির্যাতন গিয়েছে। তার চেহারা বিকৃত হয়েছে। এই যে সেই মেয়ে, যাকে কয়েকদিন আগে মাত্র দেখেছি, বিশ্বাস করা কঠিন মনে হল। তার সব সৌন্দর্য নিঃশেষিত।

তার দরজার সম্মুখে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা পেমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে তার দরজায়

তালা দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি একজন মস্ত ব্যবসায়ী। ইয়াটুঙে একজন ব্যবসায়ীর উপস্থিতি সম্বন্ধে আমরা ট্রেড-এজেন্সি থেকে খবর পেয়েছি। আশা করি, ভালো মুনাফায় তুমি আমাদের ব্যবসায়ে সাহায্য করবে। তাহলে তিব্বত ভ্রমণে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের ফরেন ব্যুরো ডিপার্টমেণ্টকে দেখিয়ে তোমার ছাড়পত্র কাল দুপুরের মধ্যেই ফেরত দেব। কিন্তু, সাবধান, কোন তিব্বতীর সংস্পর্শে এসো না। যদি এ আদেশ অমান্য কর, কোনো দেবতার সাধ্য নেই যে তোমার শরীরের হাড় রক্ষা করে।"

ঘরের ভিতর থেকে দরজায় করাঘাত বাজতে লাগল। সেদিকে চেয়ে লোকটা পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল। বলল, "তোমার মামলার রায় হয়ে গেছে। আর কোনো আপীল চলবে না।"

একজন পথিক যেতে যেতে ও কথার মর্ম বলে গেল, "আর-একটি মৃত্যুদণ্ড—।"

দেশকর্মী বলে আমাকে জানত এমন দু'জন ভারতীয় আমার সঙ্গে ওই দোকানে দেখা করতে এল। একজন মদ্যব্যবসায়ী, অন্য জনের ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবসা। তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তাদের বিশ্বাস করা যায়। সব ঘটনা বিবৃত করে বললাম, "পেমাকে বাঁচাবার জন্যে আমরা কি কিছুই করতে পারি নে?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি।" ট্র্যান্সপোর্ট-ব্যবসায়ীটি বলল।

"সে বলছে সে সিকিমী। যদি কোনো খোঁজখবর না করে তাকে মেরে ফেলা হয়, তা হলে সে একটা বিশ্রী নজির হয়ে থাকবে।"

মদ্যব্যবসায়ী বলল, "আমার একটা আইডিয়া এসেছে। ট্রেড-এজেন্সিতে যে ঝাড়ুদার থাকে তাকে এক বোতল মদ যদি দিই তা হলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। এজেন্সির রেলিঙের

ওপারেই ওই অত্যাচারীটার বাড়ি। একটা তক্তা সরিয়ে ফেলতে পারলেই মেয়েটাকে এই ট্রেড-এজেন্সিতে নিয়ে আসা যায়। কূটনৈতিক শুদ্ধতা যাকে বলে তা আছে এই এজেন্সির। দুর্বৃত্তটা যদি জানতেও পারে যে মেয়েটা এখানে আশ্রয় নিয়েছে, তবু তার কিছু করার নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, ট্রেড-এজেন্ট মহোদয় এ ব্যাপারে বাগড়া দিতে পারেন—কেননা ভারত-চীন ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রকার সন্দেহের বাইরে থাকতে চান।"

ট্র্যান্সপোর্ট-ব্যবসায়ী বলল, "একবার মেয়েটি ওই লোকটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, তাকে অন্যত্র পাচার করার ভার আমার।"

"কি করে পাচার করবে ?"

"ফারী থেকে আজ একটা ঘোড়া-টানা ওয়াগন এসেছে—তার মালিক একজন নেপালী। গাড়োয়ানটা একটা ঝানু চোরা-কারবারী। চীনা চেক-পোস্টের সঙ্গে তার খুব খাতির। তাকে মোটা কিছু দিলে সে মেয়েটিকে মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে ইয়াটুঙের বাইরে নিয়ে যাবে। এর বাইরে যেতে পারলে সরে পড়ার বহুৎ রাস্তা পাওয়া যাবে।"

সবচেয়ে জরুরি হল সময় বুঝে কাজটা করা। চীনাদের ফরেন ব্যুরো থেকে অত্যাচারীটার ফেরার আগেই কাজটা সারতে হবে। তার মানে, সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি কাজ হাঁসিল করতে হবে।

প্ল্যান অনুযায়ী সকলে যখন কাজে নামল, আমি তখন দোকান-ঘরটিতে বসে আছি আমার ছাড়পত্রটির কথা ভেবে অধৈর্য হয়ে। ট্রেড-এজেন্সির বন্ধুটির কল্যাণে দুপুরের আগেই পাসটি পেয়ে গেলাম।

ইয়াটুং শহরতলীটি পাহাড়ের এমন গভীরে বসানো যে, সূর্য উঠতে দুপুর বাজে এবং সূর্য অস্ত যায় বেলা তিনটের মধ্যে। হঠাৎ অন্ধকার নামে, আর সান্ধ্য-আইন অনুযায়ী মিলিটারীর টহল শুরু হয়। এইসব ভেবে-চিন্তে রেলিং টপ্‌কে আমি ট্রেড-এজেন্সির এলাকায় ঢুকে পড়লাম

এবং ফারীর দিকে এগুতে লাগলাম। এই পথে এলে চীনা চেক-পোস্ট এড়ানো যায়।

যে পাহাড়ে আমি উঠে এলাম সেখানে সূর্যের আলো অনেকক্ষণ ছিল। সেখান থেকে আমি দেখলাম যে, ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি নির্বিবাদে চীনা চেকপোস্ট পার হয়ে চড়াই পথ ধরে চলল। চীনাদের হেড কোয়ার্টার চুয়েন-চিউ কুঠির গেটে অত্যাচারীটিকে দেখতে পাব অনুমান করেছিলাম। তার মনিবদের তুষ্ট করার জন্যে সে নিশ্চয় আর-একটি শিকার ধরবে, একটা শিকার যখন হাতছাড়া হয়েছে তখন অবশ্যই তাকে ওই কাজ করতে হবে।

গাড়িটা যেদিকে গেল আমি সেইদিকে ফিরে তাকালাম। বসন্তকালের সন্ধ্যা আজ। গতরাত্রে অস্বাভাবিক আবহাওয়ার দরুন বরফ পড়েছে। এখন গাছের গা থেকে শব্দ করে করে বরফ খসে পড়ছে, এবং অচিরেই গলে জল হয়ে যাচ্ছে। আমি ওই গাড়ির পিছু নিলাম। অন্ধকার, ভিজে বরফ ও তুষারশীতল হাওয়া আমার গতি রুখতে পারল না।

৫। চমলহরির সংগ্রাম

অনেক রাত্রে লালচে চাঁদ উঠল, তার আলোয় পথ দেখে চললাম। চমলহরি—তিব্বতী ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে তুষার রাজ্যের শুভ্র মহিলা—দিগন্তের গায়ে সেই চমলহরি শ্বেতমুকুটে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ান। ইয়াটুঙের সেই ঘৃণিত থাবা পিছনে ফেলে এলাম।

গাড়ির চালক মোহন সিং গাড়ি থামিয়ে তার জীবন্ত পণ্যটি পরীক্ষা করতে লাগল। প্রথমে দেখা গেল সব চুপচাপ, নিস্পন্দ—কোনো প্রাণের সাড়া নেই, কিন্তু ত্রিপলটি তুলতেই শরীরটা একটু নড়ে উঠল,

চারদিকে এসব কি তা বুঝবার চেষ্টা করে সে বলল, "আমি কি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি ?"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ। তোমাকে ওই দুর্বৃত্তের থাবা থেকে নিয়ে না এলে তুমি চিরতরে ঘুমতে।"

"এখন বলো, আমি কোথায় ?"

"নির্ভয় হও। তুমি চীনাদের কবলের বাইরে।"

"আমাকে ওই ঘরে ঢুকিয়ে আমার দম বন্ধ করে দিয়েছিল। কি করে বেরিয়ে এলাম ?"

"কি করে এলে তা জেনে লাভ নেই। শুধু জেনে রাখো, মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উদ্ধার হয়েছ।"

"আমার সারা গায়ে ব্যথা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।"

"বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে আমাদের যেতে হবে এখন। যদি ঘুণাক্ষরে কেউ জানতে পারে তাহলে ওরা আমাদের পিছনে ধাওয়া করবে। চল, আমরা এগোই।"

আমার দিকে ফিরে সে বলল, "আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার ?"

মোহন সিং খানিকটা প্যাকিং ঘাস পেতে দিয়ে বলল, "আরাম করে শোও।" ভীষণ ঠাণ্ডা, আমাদের পরনেও উপযুক্ত পোশাক নেই। হাওয়াও খুব জোরে বয়ে চলেছে। গাড়ির ঝাঁকিতে চোখে ঘুমও আসছে না।

ত্রিপলের আড়ালে নিজেকে রেখে পেমা জিজ্ঞাসা করল, "আমার চুল ওরা ছেঁটে দিয়েছে। আমাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে নিশ্চয় ?"

"চুল আবার উঠবে।"

"আয়নায় মুখ দেখিনি অনেকদিন। বীভৎস দেখতে হয়েছি নিশ্চয় ?"

"ভেব না। ওসব ক্ষতচিহ্ন শুকিয়ে মুছে যাবে।"

"কি বিশ্রী দাগ থেকে যাবে।"

"দাগও তোলা যায়।"

"না। তিব্বতী মেয়ের মুখ থেকে বুঝি দাগ উঠবে না। তোমাদের দেশের অনেকের ধারণা তিব্বতী মেয়েদের দেখতে ভালো না। সত্যি, তিব্বতী মেয়েরা কদর্য নাকি?"

"যারা নিজেরাই দেখতে বীভৎস তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না।"

"তোমার হাত কি মোলায়েম আর গরম। আমার কোনো ব্যাণ্ডেজ বা ওষুধের দরকার নেই।"—বলে সে আমার হাতে চাপ দিয়ে মনের ভাব জানিয়ে বলল, "নতুন জীবন পেলাম, নতুন জীবন।"

সকাল হওয়া মাত্র আমাদের ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে পড়তে হল। রাস্তার পাশে একটা পাথরের দেয়ালে লেখা—'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'।

হঠাৎ একটা ধপ্ করে শব্দ হল। ধুলো আর পাথরকুচি এসে পড়ল গাড়ির উপর। মোহন সিং তিব্বতী ভাষায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আমাদের গুলি কোরো না, আমরা তিব্বতের পক্ষের লোক।"

ধুলো সরে যেতেই আমরা দেখতে পেলাম কার্তুজ-ভরা বন্দুক নিয়ে খাম্বারা আমাদের দিকে আসছে, তারা বলল, "গাড়ি থেকে নামো।"

আমাদের সামনেই একটা কাঠের সাঁকো তারা উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আর-একটু এগুলে অগাধ নীচের নদীতে গিয়ে পড়তাম।

"এই রাস্তায় চাকাওলা গাড়ি আমরা বরদাস্ত করিনে। আমরা সাঁকো ভেঙেছি—চীনারা আর আসতে পারবে না। ইয়াটুঙের দিক থেকে আমরা নিজেদের নিরাপদ করেছি।"

"আর এক মিনিট দেরি করা তোমাদের উচিত ছিল। তাহলে আমরা ওপারে চলে যেতে পারতাম।"

"তোমরা চীনাদের জন্যে কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছ বলে আমরা মনে

করেছিলাম। তোমাদেরও ভাগ্য ভালো যে ব্রিজটা তোমাদের পৌঁছনোর আগেই ভেঙেছে, নইলে অগাধে চলে যেতে তোমরা।"

"তাহলে খাম্বাদের পক্ষের এই নির্যাতিতাকে নিয়ে যাই কেমন করে?"

"গাড়ির ওই মেয়েটির কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"সে যদি খাম্বা দলভুক্ত হয় তাহলে ভয় কি? আরো অনেক নির্যাতন তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। যা-ই হোক, গাড়ি থেকে ঘোড়া খোলো। ঘোড়ার পিঠে জিন দিয়ে দিচ্ছি। ওতে চাপিয়ে ওকে পাশের গ্রামে নিয়ে যাও, সেখান থেকে আরো এগোবার অন্য যান পাবে। এই রাস্তার পুরো দখল পাওয়ার আগে পর্যন্ত তোমার গাড়ি আমাদের জিম্মায় থাক।"

তারা তাদের কথা-মত ব্যবস্থা করল। এবং পাশের গ্রামের পথ বাৎলে দিল। প্রায় ঘণ্টা দুয়ের রাস্তা। রাস্তা উঁচু-নীচু। এর চেয়ে হেঁটে আসাই ভালো ছিল বুঝতে পারলাম।

এই গ্রামে মাত্র একটি পাথরকুঠি—জানলা নেই, অনেকটা গুহার মত। দরজার সম্মুখে এক-পাল তিব্বতী ষাঁড় দাঁড়িয়ে। নোংরা সাজে সজ্জিত দুটি স্ত্রীলোক দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পেমাকে তারা নামাল। কুঠির মালিক না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলল।

কুঠির মালিক আর কেউ না, সেই খাম্বা যুবকটি—চুম্বিথঙের গুহায় যার সঙ্গে দেখা; ভারতীয় টহলদারের কন্যা নিমাকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিল। তার নাম জিরিং।

•

মেঝের উপরে শুয়ে পড়ে পেমা বলল, "চীনারা সাংগে রিমপোচেকে কিভাবে মেরে ফেলেছে, তোমাকে বলেছি?"

"একথা তো প্রথম শুনছি।"

"সেই দৃশ্যটা আমার ভিতরের যাবতীয় শুভকে বিনাশ করেছে।"

"কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল ?"

"সেটা একটা দুঃস্বপ্নের মত আমাকে ঘিরে আছে।"

"কি করে কি হল, শুনি।"

"যেদিন চীনারা কিরগিউ গুম্ফা আক্রমণ করে, সেইদিনই তাদের সৈন্যরা একটা চ্যাঙের দোকান লুঠ করে। তুমি হয়তো জান, চ্যাঙ যদি রোদে রাখা হয় তাহলে তা ভীষণ মাদকে পরিণত হয়। চীনারা দোকান লুঠ করে খুব বেশি পরিমাণে সেই চ্যাঙ পান করে। সেই অবস্থায় তাদের ইয়াটুঙে মার্চ করে যাবার আদেশ দেওয়া হয়। শিকারী যেমন করে বুনো জন্তু খোঁজে, পথে তারা সেইভাবে তিব্বতীদের খুঁজতে থাকে। কিন্তু পথে কাউকে না পেয়ে ক্রমেই তাদের চীৎকার আরো জঘন্য হয়ে ওঠে। রিনচেনজঙের কাছে পাহাড়ের লুকানো ঘাটি থেকে আমরা শুনছিলাম ওই শব্দ।"

"তাদের বন্দুকের পাল্লা থেকে তোমরা পালাতে পারনি ?"

"সময় ছিল না। আমাদের পুরুষদের ধারণা ছিল যে, ওই ছোট চীনা দলটিকে নিঃশেষ করে তারা ওই এলাকা চীনাদের হাত থেকে নিরাপদ করতে পারবে। কিন্তু সে প্ল্যান কাজে না লাগায় আমাদের দুঃসময় এল। চীনারা কোন্ পথে আসবে বুঝতে না পেরে আমরা মেয়েরা দল বেঁধে এক জায়গায় ঠাঁই নিই। কিন্তু মন্দভাগ্য আমাদের। কয়েকজন মাতাল সৈনিক রাস্তা থেকে পড়ে গড়াতে গড়াতে সবুজ-পাতায় ঢাকা আমাদের কাঠের কুটিরে এসে হাজির হয়।"

"সে সময় সাংগে রিমপোচে কোথায় ছিলেন ?"

"ওই মাতালরা তাঁকেই প্রথম দেখতে পায়। কিছু দূরেই বুদ্ধের একটি মূর্তি পাহাড়ে উৎকীর্ণ ছিল, তিনি সেই মূর্তির দিকে চেয়ে ধ্যান করছিলেন। আমি ছিলাম কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে, এইজন্যে

ঠিক সেই মুহূর্তে কি ঘটল দেখতে পাইনি। ধ্যান করার সময় তিনি সমস্ত পরিবেশের কথা, এমনকি নিজের কথাও ভুলে যেতেন। একটা জঘন্য চীনা সেনা তাঁর মাথার দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়াল। আমার ইচ্ছে হল ওর মাঝখানে আমি আমার মাথাটা পেতে দিই। কিন্তু তা কি সম্ভব? সেনাটি তার বন্দুকের ঘোড়া টিপে ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সাংগে রিমপোচে আওয়াজ দিলেন 'নমো বুদ্ধায়'। তিনি ওই উৎকীর্ণ মূর্তির কাছে মাথা নত করলেন, অমনি গুলিটা তাঁর মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল, তাঁর কেশও স্পর্শ করতে পারল না। সাংগে রিমপোচে আবার মাথা তুললেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—'কোনো উৎপীড়কের কাছে আমার মাথা নত হবে না, কেবল ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রণত হবে এই মস্তক।' "

বন্দুকের কোঁদা দিয়ে যখন চীনা সেনারা তাঁর মাথায় ঘা দিতে লাগল তখন সাংগে রিমপোচে কি করেছিলেন, পেমা তার নিজের অঙ্গ চালনা করে তা দেখাতে লাগল, এবং বলল, "ওই মর্মান্তিক দৃশ্যে আমাদের শরীরের রোম খাড়া হয়ে উঠল। ওই অত্যাচারী চীনাটা যেন মানুষ নয়, কোনো মানুষ অমন নির্মম নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে পারে না।"

জিরিং ঘরে ঢুকেছিল, এই কথোপকথন সে শুনছিল, এবার সে বলল; "আমাদের দেশের ধ্যানী ও জ্ঞানী লামাদের উপর এই রকম অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া আছেই—সারা দেশবাসী প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবেই।"

"সাংগে রিমপোচে পাহাড়ের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে ওই অত্যাচার সহ্য করেছেন। একটু কাৎরানি নয়, একটু আর্তনাদ নয়—একেবারে নীরবে তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর মাথায় ওই আঘাতগুলি। কিন্তু যখন চীনা শয়তানটি রিমপোচের চোখের মধ্যে গেঁথে দিল তখন তিনি বলে উঠলেন, 'হে ভগবান বুদ্ধ, আমার প্রার্থনা কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?' "

জিরিং মন্তব্য করল, "সমগ্র তিব্বতবাসীর কাছে পৌঁছেছে ওই প্রার্থনা।"

"রিমপোচের রক্তে রঞ্জিত বেয়নেট আমাদের দিকে তাক করে তারা যখন তেড়ে এল তখন আমরা বলে উঠলাম, 'জয় বুদ্ধের জয়'। চীনারা চেঁচাতে লাগল—'এইসব অপদার্থদের বুলেট দিয়ে হত্যা করা বুলেটের অপচয়। সে একটা বিলাসিতার নামান্তর। বেরিয়ে এসো কুঁড়ে থেকে। যদি না আস আমরা কুঁড়েতে আগুন দেব। কিন্তু সেটাও তোমাদের উপর সদয় ব্যবহারের মতই হবে।' " পেমা বলল।

"কি ভয়ানক ব্যাপার।"

"এ জিনিসকে সন্ত্রাস আখ্যা দিলেও সব বলা হল না। তাদের কোনো সময় না দিয়েই চীনারা কুঁড়ের দরজায় লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। ওদের মধ্যের একটা পাজি লোক আমার মাথার চুল মুঠি করে ধরল, এবং আমাকে এমন একটা লাথি দিল যে আমি চারদিক অন্ধকার দেখলাম। অন্য একটা শয়তান বলে উঠল, 'চুল থেকেই শুরু করো।' সে সময় আমার দুটি বিনুনি করা ছিল—আগে ভারতবর্ষে তুমি যেমন আমাকে দেখেছ। একটা চীনা ওই বিনুনি টেনে ধরল, অন্য একজন গোড়া ঘেঁষে বেয়নেট চালিয়ে দিল। ওতে মাথা বেয়ে রক্ত নেমে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপর আমি জ্ঞান হারালাম।"

বর্ণনা শুনে জিরিং যেন তার দৃঢ়সংকল্প জানাল, বলল, "আমাদের এই তিব্বত ভূমিতে যেখানেই তাদের পাব এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব আমরা।"

প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চাশ হাজারের বেশি খাম্বা যোদ্ধা লাসা ও ভারত-সীমান্তের মধ্যে কর্মতৎপর। চীনা দখলদারদের বিব্রত করার জন্যে এ কেবল উপদ্রব করা নয়, সমস্ত তিব্বতী জাতিই চীনাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ধর্ম সংস্কার আচার রীতিনীতির অসম্মানে ও দেশের

মৃত্তিকায় পদপাত করে নারীদের উপর অত্যাচারে তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। তাদের ঘৃণা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যাকে আখ্যা দেওয়া যায় বিস্ফোরণের অবস্থা।

সবশেষের অবস্থা বর্ণনা করে জিরিং বলল, "লাসা-সিটাং-টাওয়াং এলাকায় চীনাদের উপর জয়ী হয়েছে আমাদের সেনা। বাইরের জগতের কাছে এ কল্পনার বাইরে। চীনাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাসংখ্যার হিসাব দেখে বাইরের জগৎ অভিভূত। তাঁরা তিব্বতের অদ্ভুত পরিস্থিতি ও তিব্বতীদের চীনাদের প্রতি ঘৃণার মাত্রাটা হিসাবের মধ্যে নেন না। গত কয়েক সপ্তাহে আমাদের এই জয়ের ঘটনায় পৃথিবীর লোকের মনোভাব হয়তো বদলাবে।"

"আমরা এখন যে এলাকায় আছি তার অবস্থা কেমন?"

"এই লাসা-ইয়াটুং এলাকার কথা বলছ? এখানে মোটর চলার রাস্তা থাকায় চীনারা একটু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু রাস্তার কয়েক জায়গা ভেঙে দিয়ে আমরা আমাদের অসুবিধা দূর করে নিচ্ছি। ত্রিগু হ্রদে অবস্থিত আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে জরুরি নির্দেশ এসেছে তুনা ব্রিজ ভেঙে দিয়ে দারী-গ্যাংসি এলাকার ট্যাং গিরিপথের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করার জন্য।"

"ওই ব্রিজের ও ট্যাং গিরিপথের বুঝি খুব গুরুত্ব আছে?"

"এদের গুরুত্ব বোঝো না? ইয়াটুঙে চীনাদের ডিভিশন হেড কোয়ার্টার খুব শক্ত ঘাটি। ওই ঘাটি অতিক্রম করে ইয়াটুঙের এই দিক থেকে চুম্বিথঙে পৌঁছতে আমরা পেরে উঠছি নে। এই ব্রিজ আর গিরিপথ দিয়ে চীনারা তাদের সৈন্যসামন্ত ও রসদ নিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে সহজেই তারা চুম্বিকে কব্জা করে নেবে এবং তার ফলে অরক্ষিত ভূটান ও ভারতবর্ষ তাদের নাগালে এসে যাবে।"

"তার ফলে কি দাঁড়াবে?"

"তার ফল? দলাই লামাকে ভারতবর্ষ যেন আশ্রয় না দেয় তার

জন্যে ভারতভূমি আক্রমণ করবে বলে ভয় দেখানো। এ ব্যাপার রোধ করতে হলে আমাদের পক্ষে সিকিম ঢোকার পথ খোলা রাখার জন্য কাশা-জং-ডংকিয়া গিরিপথ আমাদের দখলে রাখতে হবে। তুনা ব্রিজ ও ট্যাং গিরিপথ ধ্বংস করলেই তা সম্ভব হবে।"

"এই কাজ করার উপযুক্ত রসদ নিশ্চয় আছে ?"

"আছে। সাহসী যোদ্ধারা আছে। তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দূরপাল্লার অস্ত্র আমাদের নেই। আমাদের পাল্লার মধ্যে তাদের পাওয়ার আগেই তারা আমাদের কচুকাটা করতে পারে।"

"রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়তো সম্ভব।"

"তাতে আমাদের সৈন্যক্ষয় হবে অনেক এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে কিনা বলা শক্ত।"

কথাবার্তায় যোগ দিয়ে মোহন সিং বলল, "এরকম ক্ষেত্রে শত্রুর মধ্যে ইন্‌ফিলট্রেট করার কৌশল নেওয়া যেতে পারে। ইথিয়োপিয়ায় ইতালীয়দের বিরুদ্ধে এই কৌশল গ্রহণ করে বেশ ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল।"

জিরিং বলল, "কিন্তু তিব্বতের অবস্থা আলাদা। এখানে চীনা-সেনাদের গুলি না খেয়ে তাদের কাছে যাওয়া অসম্ভব।"

"এ ব্যাপারে হয়তো আমি তোমাদের সহায় হতে পারব।"

"সে তো উত্তম প্রস্তাব।" জিরিং বলল, "তিব্বতের যখন এই অবস্থা তখন এমন সাহায্যের সুযোগ সে সানন্দে নেবে।"

আমি বললাম, "ইয়াটুঙের কয়েকজন ভারতীয় আমাকে আভাসে বলেছে যে, চীনাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে।"

আমার বক্তব্য বুঝতে পেরে মোহন সিং বলল, "ঠিক। চীনাদের সঙ্গে আমার হিসাব পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমি সময় গুনছি। তিব্বত ভারত বা নেপালকে প্রতারণা করার কোনো প্রশ্ন এর মধ্যে নেই।"

"চীনাদের উপর তোমার বিদ্বেষের কারণ কি ?"

"শোনো। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—কেউ তার স্ত্রীর ধর্ষককে ক্ষমা করে না। আমি একটি তিব্বতী মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর করছিলাম। চীনারা এল, বলল, 'তোমার স্ত্রী যখন তিব্বতী, তুমিও তাহলে তিব্বতী!' এ পর্যন্ত কথাটায় কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি তাহলে চীনাদের ক্রীতদাস হব, এবং তাদের হয়ে যাবতীয় নোংরা কাজ করব। কিন্তু আমি তা করতে রাজি না। তারা আমাকে নেপালে ও ভারতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে বলে। কিন্তু আমি তাদের প্রতারণা করব না তার বন্ধক-স্বরূপ তারা আমার স্ত্রীকে রেখে দিতে চায় এবং এই শর্ত দেয় যে, তারা তাকে মেরে ফেলবে না যদি সে তাদের এক পাচকের উপপত্নী হয়ে থাকে। আমি অস্বীকার করলাম, ফলে তারা আমার স্ত্রীকে হরণ করল। তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করব বলে আমি তাদের সঙ্গে আঁতাত রেখেছি।"

জিরিং বলল, "অনেকদিন থেকে তোমাকে চিনি। তুমি সৎ লোক ও সাহসী সৈনিক। তিব্বত মুক্ত হলে আমাদের সেনাবাহিনীতে তোমার মস্ত প্রমোশন হবে।"

"ওসব প্রলোভনে আমার লোভ নেই। চীনাদের আক্রমণ থেকে আমার দেশ যাতে বাঁচতে পারে তারই জন্যে তিব্বতের হয়ে লড়াই করে আমি আমার দেহের রক্ত পাত করতে রাজি। তোমাদের সমস্যা আমি বুঝেছি, এর সমাধানের জন্যে আমি অবিলম্বে যা করার করব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পেমা এর পর কি করবে ?"

জিরিং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মত করে বলল,"সেজন্যে তোমার ভাবতে হবে না। আমরা আমাদের আহত সেনাকে ফেলে রেখে চলে যাইনে। আমার পরের ক্যারাভান কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতে যাত্রা করবে।

আমরা তার সঙ্গে যোগ দেব। এবং হয়তো দোনকিয়া গিরিপথ পার হয়ে সিকিমের লাচুঙে পৌছব।”

পেমা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলল,“তিব্বতে এরা আমাকে ভালোভাবেই দেখাশুনা করবে। আমি ভারতে যাবার জন্যে ব্যগ্র। আমার বাবা নিহত হবার পরে সাংগে রিমপোচের উপর নির্ভর করেছিলাম। তিনিও গেলেন।”

“হতাশ হয়ো না।” জিরিং তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, “তোমার মত যে-সব মেয়ে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে তাদের সহায় আছেন সবার ভগবান বুদ্ধ।”

তিন দিন ধরে খাম্বাদের সঙ্গে মার্চ করে তিব্বতের ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করার মত মনের ও দেহের শক্তি আমার হয়েছে। তিব্বতী ষাঁড়ের চামড়ার তাঁবুতে আমরা বাস করলাম। পথ চলার সময় মোহন সিং আমার কম্বল আমার কাছ থেকে নিয়ে আমাকে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। এবং ওই ষাঁড়ের শুকনো গোবর পুড়িয়ে আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাতে শরীর তাতিয়েছি।

এইভাবে, যাকে বলে পৃথিবীর ছাদ, সেই উচ্চ মালভূমিতে আমরা উঠে এলাম। ফারীর চারদিকের গ্রাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা—যেখানে মানুষ বাস করে। এখানে লড়াই করার মস্ত অসুবিধে এখানকার বাতাসের বেগ। এই উচ্চতায় সময় সময় প্রবলবেগে হাওয়া বয়।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা লাসা-ইয়াটুং রাস্তায় পৌছলাম। মোহন সিং তার প্ল্যান আমাকে বলল, “আমি একজন মোটর-মেকানিস্ট সাজব, আর তুমি হবে একজন ধনী ভারতীয় বণিক। চীনাদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলব যে লাসার জন্যে তুমি ট্রাক বোঝাই করে দামী মাল নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু মোটর বিগড়েছে, খাম্বারা লুঠ করতে পারে। এতে

চীনাদেরই ক্ষতি। কেননা তাদের জন্যে ঘড়ি ফাউণ্টেনপেন বাইনোকুলার ও রেডিয়ো সেট আছে। এই বলে তাদের সাহায্য চাইব। তারা মোটর সারাতে সাহায্য করলে জিনিসপত্রে তাদের মজুরি দেব। এতে তারা কি করে দেখব। এইভাবে আমরা তাদের ক্যাম্প দেখে নেব।"

চীনারা যাতে বিশ্বাস করে এইজন্যে আগে থেকেই সে একটি পুরনো আর ভাঙা ট্রাক যোগাড় করেছে।

চীনা পেট্রল-পোস্টে এসে গেলাম আমরা। কোনো আলো ছিল না বলে আগে বুঝতে পারিনি। একটা তাঁবুর মধ্য থেকে সাড়া এল, আমাদের চ্যালেঞ্জ করল। মোহন সিং উত্তর দিল, বলল, "আমরা। মোটর-ট্রেডের লোক। তোমাদের গাড়ি সারাতে এসেছি।"

রাস্তার বাধা সরিয়ে দিয়ে ওদের একজন বলল, "ভিতরে যাও।"

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি রাস্তার পাশে চীনাদের সেনাবাহিনীর অনেক মোটরগাড়ি দাঁড় করানো।

মোহন সিং চাপা গলায় বলল, "লুঠ করার মত বহুৎ মাল পেয়েছি।"

তার পরেই দেখলাম ব্যারাকের মত বাড়ি। একটা লণ্ঠন জ্বলছে, আলো অল্প। হল-ঘরে প্রায় শ-তিনেক সৈনিক। এখন মাত্র সন্ধ্যা। কিন্তু সকলেই শুয়ে পড়েছে। হয়তো সংকেত পাওয়া মাত্র লড়াইয়ে নামবার জন্যে তারা এইভাবে বিশ্রাম করছে। একই দিক থেকে আবার হুংকার বেজে উঠতেই মোহন সিং আগের মতই উত্তর দিল। একটা শক্ত লোক হয়তো আমাদের মুখ দেখার জন্যে কাছে এগিয়ে এল। মোহন সিং চীনা ভাষা জানত তাই রক্ষে, বলল, "কমরেড কর্নেল, আমাদের গাড়িটা কিছু দূরে আটকে আছে।"

"মিথ্যা কথা বলছ। শয়তানের বাচ্চা।" বলিষ্ঠ সৈনিকটি বলল, "প্রথমত, আমি মাত্র একজন কর্পোরাল। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, আজ সকালে খাম্বা সেনারা তুনা ব্রিজ ভেঙে দিয়েছে। তোমাদের ট্রাক পথের এ পারে কি করে আসতে পারে?"

"আমি অন্য দিকের কথা বলছি, হুজুর।"

"ওদিক সম্বন্ধে আমার কিছু করার নেই। ওদিকের জন্য অন্য অফিসার আছে। সেই কুত্তার সঙ্গে গিয়ে কথা বল। পার্টির কর্তাদের কাছে সে সব সময় আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে। প্রহরী, এদের নিয়ে যাও। আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত যেন কেউ না করে।"

অন্য অফিসারের বদলে আমরা গিয়ে হাজির হলাম বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বিশ্রামালয়ে। কর্তব্যরত লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "সব বিছানা খালি। আমাদের সব লোক তুনার ওপারে আটক পড়েছে। তোমরাও নিশ্চয় ওই ইউনিটের লোক ?"

আমি মাথা নাড়লাম। আমার কথা শুনে তার বিশ্বাস হল। একটা সাজানো গুছানো ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে সে একটা মস্ত খাতা খুলে দিল আমাদের পৌঁছনোর সময় নোট করার জন্যে। "শুধু ফাঁকগুলো পূরণ করে দাও। কি পছন্দ কর তোমরা—কিয়েভের মুরগী, না পিকিং-এর শুয়োর ?"

"দুই রকম খানাই। আমরা ভাগাভাগি করে খাব।"

মোহন সিং বলল, "এখানে আসা খুব দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। সাবধান, ওরা যেন আমাদের সন্দেহ না করে। তোমার ছাড়পত্র অনুযায়ী ফাঁক পূরণ করো। আমাদের যদি তল্লাস করে, যেন কোনো গরমিল না পায়।"

চমৎকার রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে আমরা পড়লাম। আট রকমের পদ বিশিষ্ট খানা খেয়ে ঘুম পেল। কিন্তু মোহন সিং বলল, "অনেক কাজ আছে, মাঝরাতে আমি পালাব। প্রথমে আমি চীনাদের গাড়ি সারানোর ভান করব, এবং ওগুলোর পেট্রল-ট্যাঙ্কে কাদা ভরে দিয়ে ওগুলোকে অকেজো করব। তারপর গোলন্দাজদের সঙ্গে জুটে গিয়ে তাদের লক্ষ্য ভুল করে দেব। জীবনে প্রতিশোধ নেবার এই পরম সুযোগ। তুমি জান, ভোরের আগেই আমাদের সেনারা এদের

আক্রমণ করবে। বেশিক্ষণ ঘুমিয়ো না। প্রথম বন্দুকের শব্দ শোনা মাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ওই ডান দিকের পাহাড়ে গিয়ে লুকোবে।"

আমি বললাম, "তুমি সফল হও।"—বলে পরীর দেশের শয্যার মত পাখির পালকের মত নরম বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

প্রত্যাশিত সেই প্রথম গুলির শব্দের আগেই চীনা প্রহরীর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে আমার পোশাক খুঁজতে লাগলাম। জামা-টামা একেবারে শতছিন্ন।

সৌভাগ্যক্রমে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ায় ঘরের জিনিসপত্র দেখতে পেলাম। মোজার বদলে পায়ে জড়াবার মত কিছু আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে লালসেনার ইউনিফর্ম ঝুলছে দেখতে পেলাম। তার নীচেই একজোড়া বুট। পাশের দেরাজে বাইনোকুলার। একটা চকচকে রিভলভার ও কার্তুজ। স্ট্র্যাপে শ' খানেক বুলেট। এসব যে অফিসারের সে নিশ্চয় মেস-এ মদ্যপান করতে গিয়েছে এবং মদের ঝোঁকে নিজের কামরায় না এসে অন্য কামরায় ঢুকেছে।

আমার কাছে এইসব জিনিস ঈশ্বরের দান বলে মনে হল। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে আমি পোশাকটি পরে নিয়ে স্ট্র্যাপ ঝুলিয়ে নিলাম কাঁধে। বুটও পায়ে লেগে গেল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিজেকে দুরস্ত করে নিচ্ছি, দেখি, একটা ওভারকোট—তাতে লাল সেনাবাহিনীর কর্নেলের চিহ্ন আঁটা। ওভারকোটটি চাপিয়ে বেশ আরাম আর আনন্দ পেলাম। বাইনোকুলার হাতে নিয়ে আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, প্রহরীর তখনও নাক ডাকছে।

এর পর ব্যারাকবাড়ির ও পাহারা-ঘাটির প্রহরীরা উঠে দাঁড়িয়ে দস্তুরমত সেলাম ঠুকল। তাদের সেলামের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আমি চীনা আস্তানা পার হলাম এবং পাহাড়ের দিকে এগুতে লাগলাম।

সহজে ওঠা যায় এমন একটা পাহাড় বেছে নিলাম, সেখান থেকে

আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারব। যদি কোনো গোলা এদিকে এসে পড়ে, যার সম্ভাবনা খুব কম, তবে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটি শিলাখণ্ডের আড়ালে দাঁড়ালাম।

অনেকক্ষণ আমার মনে হল চারদিকে সকলে নিদ্রামগ্ন। তারপর মনে হল কালো ঢেউ যেন উঠে আসছে এবং ক্রমশ যেন চীনাদের ঘিরে ফেলছে। একটি ঘাটি হয়তো বুঝতে পেরেছে এদের ঘাটি কোথায়, তাই রঙিন রকেট ছেড়েছে। প্রথমে তা উজ্জ্বল লাল আলো বিস্তার করল, মনে হল যেন সকালের সূর্য সোজাসুজি আকাশে উঠে আবার যেন নামতে আরম্ভ করেছে। চলমান খচ্চর ও লোকজনকে ওই আলোতে দেখা গেল, মনে হল তারা যেন মাটিতে গাঁথা হয়ে দাঁড়ানো।

অবিলম্বে আরম্ভ হল গুলিবর্ষণ। বুঝতে পারলাম খাম্বারা তাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেয়েছে এবার এই চীনা ঘাটি। চীনাদের দিক থেকে খুব ভারী গোলা ছুটল, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর গোলার শব্দ পেলাম। কিন্তু তার পাল্লা বড় বেশি, অনেক দূরে গিয়ে পড়ল, তাতে খাম্বাদের কিছু হল না। ক্রমশ দু' তরফের গোলাগুলির শব্দে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি বেজে উঠে এই ভয়ংকর গর্জনের সৃষ্টি হল।

খাম্বাদের অগ্রগমন অনেকটা সমুদ্রের ঢেউ-এর মত আসতে লাগল এবং অবিলম্বে চীনা ক্যাম্প ঘিরে ফেলল। একেবারে না থেমে গুলি চালাতে লাগল খাম্বারা। শত্রুপক্ষ হকচকিয়ে গেল।

এই সময়ে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ হল। প্রথমে ট্রাকে তারপর ব্যারাকে আগুন লাগল ; তারপর গোলাগুলির গুদামে ও পেট্রল ট্যাঙ্কে। ক্রমে সেই অগ্নিশিখা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠল।

সূর্য ওঠার আগেই এইসব ঘটনা ঘটল। চীনাদের উপর খাম্বাদের এইভাবে জয় হল। আমি যেখানে লুকিয়ে আছি, কয়েকজন চীনা ও তাদের পরামর্শদাতা সেই পাহাড়ের গায়ে এসে উপস্থিত হল। আতঙ্কে

তারা আর্তনাদ করছে শুনতে পেলাম। পাছে তারা আমাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে শিলাখণ্ডের আড়ালে নিজেকে রেখে আমি তাদের উপর গুলি নিক্ষেপ করলাম। ইতিমধ্যে খাম্বারা এসে গিয়েছে, তারা এসে তাদের সাবাড় করল। মোহন সিং তাদের পাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে আমাকে চিনতে পারেনি, আমাকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে গিয়েছিল ; আমি তার নাম ধরে ডাকতেই থেমে গেল।

মোহন সিং যে সেদিনের একজন প্রকৃত বীর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খাম্বাবাহিনীর বড় বড় সেনাধ্যক্ষরা তাকে একে একে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। দোরজের গায়ে একটি চীনা ওভারকোট, তাতে কর্নেলের প্রতীক আঁটা, সে এসে মস্ত সংবাদটা ঘোষণা করল ; সে সংবাদ শোনার জন্যে আমরা ব্যগ্র ছিলাম, দোরজে বলল, "কয়েক দিন আগে দলাই লামা ভারতসীমান্তে পৌঁছেছেন ; এবং এইমাত্র রেডিয়োয় ঘোষণা করল যে, বুদ্ধের ভূমি ভারতবর্ষ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।"

সমগ্র খাম্বা সৈনিক উল্লাস করে উঠল। হাতের কাছে যা পেল, আনন্দের আতিশয্যে তাই বাদ্যযন্ত্রের মত করে তারা বাজাতে লাগল। যে খাদ্যসামগ্রী এখানে হস্তগত করা গেল তা সমস্ত খাম্বাবাহিনীর ও আশপাশের অধিবাসীদের পক্ষে যথেষ্ট।

জিরিং কয়েকজন নাচিয়ে ও গাইয়ে এনে হাজির, তারা নেচে নেচে গাইতে লাগল, "শ্যাংবো শ্যাংবো! হে ভগবান, হে তথাগত—এই গিরিপথ আমাদের।"

পাথরকুচি ফুল বা ঘাস—তুষারের মধ্যে খুঁজে খুঁজে যা পেলাম, বিস্কুটের সঙ্গে সেইসব উৎসর্গ করলাম ভগবানের উদ্দেশে। তাঁর করুণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

চমলহরি পাহাড়ের চূড়া রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে। ওর শিখর ভগবান বুদ্ধের প্রসন্ন হাস্যময় মূর্তির মত সমুজ্জ্বল।

সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে যেন সমগ্র তিব্বতী মালভূমি এবং তার অধিবাসিবৃন্দ গান গাইতে লাগল। তারা তাদের জীবনের চরম আনন্দ প্রকাশ করল এইভাবে।

৬। স্বাধীন তিব্বতের অভ্যন্তরে

পাহাড়ের শীর্ষে বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। নীচের দিকে সেই গলিত বরফ প্রবল স্রোতের আকার ধারণ করেছে, এবং অবশেষে তা গিয়ে নদীতে পড়ে নদীকে স্ফীত করে তুলেছে। সেই নদীধারা গিয়ে মিশেছে হ্রাম-সী হ্রদে। তিব্বতের এই দিকটায় এখন বসন্ত ঋতু।

তোংগু গুম্ফায় প্রার্থনা না করে খাম্বারা চীনের বিরুদ্ধে তাদের জয়কে যেন সম্পূর্ণ বোধ করল না। পবিত্র চমলহরির পাদদেশস্থ লাসা যাবার সড়কের উপর তোংগু অবস্থিত এবং এর গা দিয়ে ভূটানে যাবার কয়েকটি গিরিপথ—এইজন্যে গুম্ফাটি বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। লোকে বলে, অনেক দেবমূর্তি ও বিগ্রহ সোনায় মোড়া, এবং অনেক শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি নাকি ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছে।

“আ, কী চমৎকার ওই মূর্তিগুলি!” জিরিং আমাকে বলল, “এই গুম্ফায় যেমন মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে, লাসার বড় বড় মঠেও তা নেই। একে চীনা সেনারা যখন ভাঙতে আরম্ভ করল তখন প্রধান মঠাধ্যক্ষ এখানে আর থাকলেন না, তিনি সোজা ওই হ্রাম-সী হ্রদে গিয়ে ডুবে মৃত্যুবরণ করলেন।”

তাশী নামে একটি যুবক আমাদের সঙ্গে ছিল, সে বলল, “ভাগ্যক্রমে খাঁটি সোনায় তৈরি তারা-বিগ্রহটি চীনাদের হাতে পড়েনি। লাসায় চীনারা ঢোকার আগে দলাই লামা যখন তাঁর ধনসম্পদ সরাতে আরম্ভ করেন, আমরা বুঝতে পারি হাওয়া কোন্ দিকে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি

প্রায় এক শ' খচ্চরের টানা গাড়ি ধনরত্নে বোঝাই হয়ে ভারতের দিকে চলেছে। সেই রাত্রেই আমি ঝোগপার সাজে সজ্জিত হয়ে তারা-বিগ্রহটি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই।"

"কোথায় নিয়ে গেলে ?"

"অন্যান্য ধনসম্পদের সঙ্গে আমরা ওই বিগ্রহটি সিকিম-সীমান্তে খাংবু-চু উপত্যকায় রেখেছি। এখন শুনছি, ভারত আক্রমণ করার জন্যে চীনারা নাকি সেখানে রাস্তা বানাচ্ছে। এইজন্যে সে জায়গা থেকে আমরা ধনসম্পদ সরাবার চেষ্টা করছি।"

মাত্র দিন-দুই আগে তোংগু গুম্ফা থেকে চীনারা বিতাড়িত হয়েছে। এইজন্যে এখানে প্রার্থনা করার আগে জায়গাটা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হয়েছে। কৃষাণেরা, লামারা ও সেনারা সকলে এই কাজে হাত লাগায়। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে যে, বুদ্ধের যে শ্বেতপাথরের মূর্তিটা হারিয়েছে, সেটা আবার পাওয়া যেতে পারে। ওই আশ্চর্য ব্যাপারটি কখন ঘটে তার জন্যে সকলে ব্যগ্র হয়ে আছে। গুম্ফাটা প্রথম দেখলে মনে হয় এখানে অন্ধকার সেই মধ্য যুগের কোনো দুর্বৃত্ত বুঝি হানা দিয়েছিল। বড় ফটকটা নেই। তাশী বলল, "চীনারা যখন এখানে আসে তখন ভীষণ ঠাণ্ডা। নিজেদের গরম করার জন্যে তারা কাঠের ফটকটা জ্বেলে নেয়।"

আমরা একটা প্রশস্ত চত্বরে ঢুকলাম। তার তিন দিকে দুইতলা গ্যালারি, বড় বড় স্তম্ভের উপর তা বসানো। তাশী বলল, "তিব্বতী ভাষায় একে আমরা বলি লাপরাং—অর্থাৎ লামাদের বাসস্থান। আমাদের সম্মুখে ওই লা-কাং বা মন্দির।"

এখানকারও বড় বড় কাঠের দরজা নেই। তাতে লামাদের যেন পরোয়া নেই। আমাদের দেখে লামারা উল্লাসের সঙ্গে ড্রাম পিটতে লাগলেন।

গুম্ফায় নূতন প্রাণের ও নূতন প্রেরণার সঞ্চার হল। যে-সব বৃদ্ধ

লামা খাম্বাদের সঙ্গে এক হয়ে চীনাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন; তাঁরা শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তির আবির্ভাবের প্রত্যাশায় বসে আছেন। প্রধান পুরোহিত এগিয়ে এসে পর্দাটা সরালেন, আমরা দেখতে পেলাম দেয়ালের গায়ে অনেক বিগ্রহমূর্তি দাঁড় করানো। তার কোনো-কোনোটা কাঠের তৈরি, কিন্তু তবু তা রক্ষা পেয়েছে; চীনাদের আগুনের আঁচে মুখগুলো কালচে হয়ে গিয়েছে। ওই মূর্তিগুলির নীচে পিতলের প্রদীপ, তাতে পলতে জ্বলছে।

পরের মঠটা হচ্ছে কুনজুক-সাম। কথাটার অর্থ হচ্ছে—তিন বিগ্রহ। এখানে তিনটি বিগ্রহ রাখা আছে। প্রধান পুরোহিত বললেন, "এই তিন বিগ্রহ হচ্ছে—অপ্‌ তেজ মরুৎ। আমাদের কাছে এ তিন হচ্ছে—স্বর, করুণা ও জীবনতৃষ্ণার প্রতীক। আমরা যাকে কাজর বলি, তার আট শ' খণ্ড পুঁথিতে এর ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু চীনারা সেগুলিতে আগুন লাগায় আগে।"

একটা পৃথক পথ আছে কুনজুক-চিক পর্যন্ত। এর অর্থ—কেবল-মাত্র ভগবান। এখানে আমরা দেখলাম উলের তৈরি কার্পেটে মেঝে ঢাকা। উপর থেকে আলো এসে পড়ছে বিরাট বুদ্ধমূর্তির মুখে।

প্রথমে মনে হল এই স্থাপত্য সারনাথের বুদ্ধমূর্তির অবিকল অনুকরণ। কিন্তু হাতুড়ির আঘাতে ওই মূর্তির নীচুটা জখম হয়েছে—প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটি মৃগ ও পাঁচটি শিষ্যের মূর্তি ওখানে উৎকীর্ণ ছিল। বুদ্ধমূর্তিটির হাত ও কাঁধ ভাঙা, কিন্তু মাথাটি অটুট আছে। উপর থেকে আলো পড়ে ওই মূর্তি যেন হীরের মত জ্বলছে।

ওই মূর্তির সম্মুখে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বলে উঠল, "ওই সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা।"

ফ্লুট বাজল, ঘণ্টা ধ্বনিত হয়ে উঠল। ওই সম্মিলিত শব্দে প্রধান মঠাধ্যক্ষের প্রার্থনাবাণী শোনা যাচ্ছিল না।

তিনি বলতে লাগলেন—"স্বাধীন তিব্বতই বৌদ্ধ-স্বর্গভূমি। চীনা

হানাদারদের কাছ থেকে এ ভূমি মুক্ত করতে হবে। আমাদের ধর্ম হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতি, এইজন্যে এর বিনাশ নেই। চীনারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তারা এই ধর্ম নাশ করতে পারবে না, উপরন্তু তাদের এই অপকর্মের জন্যে তারা বিশ্ববাসীর কাছে নিন্দিত হবে। ভগবান তথাগতের প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে চীনাদের এই কার্য নরকের গ্লানি। এই গ্লানি থেকে তিব্বত রক্ষা পাবে। এই দুর্দশা থেকে ত্রাণ পাওয়ার উপায় কি ? তিব্বতের ভূমি থেকে চীনাদের তাড়ানো। এই কাজে প্রত্যেক তিব্বতী হবে এক-একজন চানচাব, অর্থাৎ মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে ভগবানের শিষ্য।"

সকলে মূর্তিটি প্রদক্ষিণ করে প্রার্থনা-গীত গাইতে লাগল। তাদের দেখে মনে হল তিব্বতকে মুক্ত তারা করবেই।

সুউচ্চ চমলহরির পিছনে সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই খাম্বারা তাদের পরামর্শ-সভায় মিলিত হল। অন্যান্য জায়গা থেকে খবর এসে পৌঁছল যে, চীনারা শাক্য গুম্ফা ও বাদু গুম্ফা কলুষিত করেছে। প্রধান অধ্যক্ষ তাঁর পরিবার নিয়ে পালাতে পেরেছেন, কিন্তু চীনারা ধনসম্পত্তি হাত করতে পেরেছে, এবং যাদের পেয়েছে তাদের অনেককে নানাভাবে নিপীড়িত করেছে, কাউকে কাউকে করেছে গ্রেপ্তার। লুঠতরাজ করে তারা চীনের পথে সোজা শিগাৎসীতে গিয়েছে।

সোনাম নামে একটি খাম্বা চীনাদের কবল থেকে পালিয়েছে, এবং তোংগু গুম্ফায় বিজয়-উৎসব হচ্ছে জেনে এখানে এসেছে। পথের শ্রমে সে এতই ক্লান্ত যে, এখানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাচার নিবেদন করেই পরামর্শ-সভার মাঝখানে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সময় নষ্ট করা চলে না, এইজন্যে একজন বলে উঠল, "আমাদের প্রধান অধ্যক্ষ বলে দিন—এর পরে আমরা কোন্ দিকে আক্রমণ করব।"

প্রধান অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "আমাদের সেনার অর্ধেক

অবিলম্বে উত্তর দিকে যাত্রা করুক। শিগাৎসী-লাসা সড়কের কাছে নিশ্চয় চীনাদের সঙ্গে মোলাকাত হবে, তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে বন্দী তিব্বতীদের। আত্মজনকে উদ্ধার করা ধর্মের কাজ।”

এসব ক্ষেত্রে খাম্বাদের নিয়ম হচ্ছে—শোনা মাত্র কাজ করা। ওই আদেশ শোনা মাত্র অধ্যক্ষের উত্তর দিকে যে অর্ধেক সেনা ছিল তারা যাত্রা করল।

পরামর্শ-সভার কাজ চলল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, “চীনারা সিকিম সীমান্তের খাংবু-চুর উপর চাপ দিচ্ছে। ওই পথে শাক্য গুম্ফার প্রধান ও অন্যান্যরা ভারতের পথে যাত্রা করেছেন। চীনাদের ওই রাস্তাটা বন্ধ করায় বাধা দেব না?”

পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন অধ্যক্ষ, বললেন, “নিশ্চয়। ওই গিরিপথে চীনারা যাতে পৌঁছতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওইটে ১৭০০০ ফুট উচ্চ গোরা গিরিপথ নয়?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরা গিরিপথের কথাই আমরা বলছি।”

“পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সৈনিক ওই পথ রক্ষার জন্যে থাক। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে নিয়ে ওখানে যুক্ত করতে হবে। যারা ভারতের দিকে যাত্রা করেছে, তাদের রক্ষা করাও হবে এই পঞ্চাশ জনের বাড়তি কর্তব্য। কি, এই প্রস্তাবে সকলে রাজি?”

“হ্যাঁ। রাজি।” সমস্ত সভা চেঁচিয়ে উঠল।

“তা হলে ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের সভা ভঙ্গ হোক।”

“হ্যাঁ। সভা ভঙ্গ হোক।” খাম্বারা চেঁচিয়ে উঠল, “চল, যুদ্ধে চল। বুদ্ধের জয়।”

জনতা চীৎকার করতে লাগল, “বুদ্ধের শাশ্বত জয়। তথাগতের শাশ্বত গৌরব।”

এই বলেই তারা ঝাঁপ দিল সংগ্রামে।

আমার হাত ধরে ফেলে তাশী বলল, "শোনো। আমাদের বাহিনী সিকিম-সীমান্তের দিকে যাত্রা করেছে। তুমি এতে যোগ দাও।"

অনেক সাহসী যুবা তিব্বতী আমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলল। তাদের মধ্যে অনেককে জানি যারা মৃত্যুর মুখেও ঘোরতর সাহস দেখিয়েছে। দোরজে একজন পাকা খাম্বা কম্যাণ্ডার। চীনাদের মুখোমুখি তার হওয়া চাই, এবং চীনাদের হারানো চাইই। সে চুম্বি উপত্যকায় কয়েকবার বেশ সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। এবার সে কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর দিকে তাদের হারাতে চায়। জিরিংও লাসার রাস্তার কয়েকটা গেরিলাযুদ্ধে তাদের হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। লামা লোবস্যাং কয়েকটি গুম্ফার ঘাটি থেকে চীনাদের হঠিয়েছে। চীনাদের কবল থেকে জাতীয় সম্পদ সরানোর ব্যাপারে তাশীর অদ্ভুত কুশলতা। ভারতের সীমান্তে পাহাড়ের খাঁজে সে অনেক ধনরত্ন ও স্বর্ণমূর্তি লুকিয়েছে। চীনাদের পক্ষে তা খুঁজে বের করা অসাধ্য। সে-সব সংখ্যায় এতই বেশি যে, কোথায় সে কি রেখেছে তাই তার মনে নেই।

দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের কাজে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তাদের পরিশ্রম গিয়েছে আরো বেশি। মার্চ করার সময়ে তারা বাচ্চাকাচ্চা সামলিয়েছে, রান্নাবান্না করেছে, এবং তাদের ক্যাম্পে যখন শত্রুরা হানা দিতে এসেছে তখন ধরেছে রাইফেল। কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন বলে মেয়েরা লাঞ্ছনা ভোগ করেছে কম না। কেননা চীনারা তাদের উপর না করেছে হেন অপকর্ম নেই। অনেক মেয়ে চীনাদের কবল থেকে পালিয়ে এসেও বড় দুঃখে দিন কাটিয়েছে। তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

সাধারণ তিব্বতীর সঙ্গে মিশে তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বদলে গিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বইতে যা পড়েছি তার সঙ্গে মিল নেই কোনো। তাদের যে পর্যায়েই ফেলা হোক, তাদের কখনো অশিক্ষিত বলা যায়

না। তাদের সরলতাই তাদের বিশেষ গুণ, অনেক আধুনিক সভ্যতা-সম্পন্ন মানুষের সে গুণ নেই।

তাদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা অত্যাশ্চর্য ঘটনায় বিশ্বাস করে। এই দুর্গম দেশে পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চলে বাস করে তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে। কিন্তু তাশী ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে বলল, "আমাদের দেশে সাধারণ আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটানো সম্ভব।"

"যথা—"

"শ্বেতপাথরের বুদ্ধের কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে? আমি গোপন ব্যাপারটি বলি। চীনারা যখন মঠটিতে লুঠতরাজ করল, তখন তারা স্বর্ণমূর্তিটি দেখতে পেল না। আমরা আগে থেকেই তা সরাই। এইজন্যে তারা বুদ্ধকে গাল দিল, এবং তাঁর 'মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা' দিল। এক জোয়ান হূন এক কুঠারের ঘা দিয়ে ছিন্নমুণ্ড করল বুদ্ধকে। তাঁর ধড়টা টেনে নিয়ে জঞ্জালের মধ্যে ফেলল। যাকে আমরা অন্ধকার যুগ বলি, সেই সময়ে শত্রুর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যাবার রীতি ছিল অসভ্য জাতির মধ্যে, সেই রীতি অনুসরণ করল ওরা বুদ্ধের মুণ্ডটি নিয়ে। কিছুদূর টেনে নিয়ে পণ্ডশ্রম মনে করে তারা তা ছুঁড়ে ফেলল। ঘটনাচক্রে ওই জায়গাতেই আমি তারার স্বর্ণমূর্তিটি রাখি। ধনসম্পদ উদ্ধার করতে আমি যখন গেলাম, তখন বুদ্ধের মুণ্ডটিও কুড়িয়ে নিলাম। পরে জঞ্জালের মধ্যে ধড়টা পেলাম। ওই ধড়ের উপর মাথাটি বসাতে পারলেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটানো সম্ভব।"

"সত্যিই বড় মজার ঘটনা।"

"বুদ্ধের এই পুনরাবির্ভাবের কথা যারা শুনল তারাই অবাক হল। তাহলেই বোঝো, দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়েই যাবে।"

"সত্যি তোমরা কেমন সরল ও সাদাসিধে।"

"না। আমরা অশিক্ষিত। চীনাদের আইনে এই আমাদের অপরাধ। এই অজুহাতে একটা জাতির উপর তাদের এই জুলুম।"

আমাদের দু' পাশের ভূমি উঁচু নীচু ও জনহীন। এমনই স্তব্ধ ও নীরব এই ভূমি যে, খচ্চরের খুরের শব্দ কেবল বাজতে লাগল কানে।

চার দিন মার্চ করার পর আমাদের চোখের সম্মুখে দেখা দিল খাংবু-চু। নদীটা বড় উচ্ছৃঙ্খল ঠেকল, বসন্তকালের বরফে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আমরা থামলাম। কয়েকজনকে একটি ভালো দুর্গের সন্ধানে পাঠানো হল।

একটা বাহিনী আগেই ফারী ত্যাগ করেছে, সেদিন বিকেলে অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের পথপ্রদর্শক বলল যে, কাম্‌পা জংক পৌঁছবার আগেই সেখানকার লোকজন আরো পশ্চিমে চীনাদের তৎপরতার কথা তাদের জানায়। এই জন্যে তারা তাদের পথ বদল করে আমাদের মতই গোরা গিরিপথের দিকে চলেছে।

পেমা তার খচ্চরের লাগাম সামলে চটের থলে দিয়ে তার ন্যাড়া মাথাটি ঢেকে আছে। কিন্তু তার এ চেষ্টা বিফল হচ্ছে বুঝে সে ম্লান হাসল, বলল, "তুমি এখন আমার চুল দেখতে পাচ্ছ?"

"খুব তাড়াতাড়ি গজাচ্ছে বটে।"

"আশ্চর্য। চীনারাও তা বুঝেছে। এই জন্যে আমার মাথার জন্যে দু' হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ কি রকম দামী জিনিস এটা?"

"ওরা কৃপণ।"

"তারা তোমার পিছনেও লেগেছে। এই রকম গুজব ছড়িয়েছে যে, একজন ভারতীয় ডাকাত নিজেকে বণিক ও ডাক্তার বলে প্রচার করে খাম্বাবাহিনী পরিচালনা করছে। প্রত্যেক চীনা সেনাকে

অর্ডার দেওয়া হয়েছে ওই ভারতীয়কে দেখামাত্র যেন গুলি করা হয়।”

“আমরা একই পথের পথিক।”

আমাদের টহলদাররা এসে জানাল যে চীনা ঘাটি মাত্র এই নদীর মাইল পাঁচ নীচের দিকে। একটা কাঠের সাঁকো উঁচুর দিকে মাইল খানেক দূরে, সেটা এখনো অটুট আছে। সম্ভবত চীনারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

আমরা আগামী প্রাতে সূর্যোদয়ের আগেই ওই সাঁকো পার হব ঠিক করলাম।

খচ্চরগুলি ছেড়ে দেওয়া ছিল। তাদের মুখে লাগাম লাগানো হল ও পিঠে বসানো হল কাঠের জিন। তখনও চারদিক অন্ধকার। দোরজে পরবর্তী প্রোগ্রামের কথা বলল, “চীনাদের ঘাটি যখন আমাদের কাছেই তখন আমাদের বেশিসংখ্যক লোকের খাংবু-চু নদী পার হওয়া ঠিক হবে না। ওপার সুবিধার জায়গা নয়। চীনাদের বাধা দেবার মত সুবিধাজনক ভূমি নয় ওপার। তাদের ভালো ভালো অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল সেনা নিয়ে তারা আমাদের পর্যুদস্ত করে দিতে পারে। আমাদের মধ্যের মাত্র কয়েকজন ওপারে যাবে, তার মধ্যের ডজন খানেক লোক আহত হয়েও যদি ভারতবর্ষে ঢুকতে পারে তাহলেই নিজেদের ভাগ্যবান জ্ঞান করব।”

“ওই গিরিপথ পার হওয়া ওরা কি এতই কঠিন করে রেখেছে?”

“ভারত সরকার যে মনোবল অবলম্বন করেছেন, চীনারা ভাবছে তা হয়তো তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। আরো দুঃখের কথা এই যে, বেশি-সংখ্যক তিব্বতীকে সীমান্ত পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। যারা যাচ্ছে তারাও অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে। সীমান্ত পার হওয়া মাত্র আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে রাখা হচ্ছে।”

“এতে লড়াই আরো কঠিন হয়ে পড়ছে?”

"এতে অসুবিধে অনেক। খানিকটা এলাকা আমরা চাই যা স্বাধীন তিব্বত বলে মনে করতে পারি। এই জন্যে হিমালয়ের গিরি-পথের কাছাকাছি আমাদের জায়গা বেছে নিতে হচ্ছে।"

চীনাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যে কিছু টহলদার সে মোতায়েন করেছে। যা সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে, নদীর উপর দিকে কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়া নিরাপদ। এই সব ব্যবস্থা করে দোরজে বিভিন্ন দিকে আমাদের বাহিনী ছড়িয়ে রাখল।

নদী পার হবার জন্যে আমরা সাতজন নির্বাচিত হলাম। ওপারে গিয়ে পেমা বলল, "কিছুক্ষণ আমাকে নদীর কিনারে একা থাকতে দাও। যা ফেলে এলাম এখান থেকে তাদের দিকে একবার ফিরে দেখতে চাই।"

সে তার দেশের হাওয়া নিল বুক ভরে।

পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্য উঠল। নদীটার অনেক পাক, অনেক ঘন বন ও অনেক খানাখন্দ। উপরটা আরশির মত চকচকে।

পেমা গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিব্বতের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। মাথার উপরে উড়োজাহাজের শব্দ—তার রং রুপোর মত, কিন্তু তার ছায়া মৃত্যুর মত।

আমাদের খচ্চরবাহিনীর রক্ষক লোবস্যাং নির্দেশ দিতে জানে। সে চ্যাঁচাল, "লুকিয়ে পড়।" খচ্চরেরাও সংকেত বোঝে, তারাও পাকা সৈনিকের মত আচ্ছাদন নিল।

কেবল নড়ল না পেমা। লোবস্যাং তার এক সহচরীকে ডাকল, "যাও, ওর খচ্চরটাকে নিয়ে শিলার আড়ালে লুকোও।"

বাতাসের জন্যে পেমার কানে ওই কথা পৌঁছল না। তাই আরো চেঁচিয়ে উঠল লোবস্যাং, "পেমা, শিলার আড়ালে যাও। পাহাড়ের খাঁজে লুকোও।"

এবার সে শুনতে পেল। উপরের উড়ো জাহাজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে এগুতে লাগল। লোবস্যাং বলল, "তারা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা এগোবার আগে এইভাবে দেখে নেয়।"

বিমানটা মোড় ঘুরে ফের আমাদের দিকে এল। এবার অনেক নীচু দিয়ে উড়ল। লোবস্যাং বলল, "পেমা, এবার আমাদের জন্যেই আসছে।"

পেমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল এবং দৌড়তে গিয়ে বলল, "দাঁড়াও, আমার চিরুনীটা! মুসৌরীর সেই চিরুনী।"

সে থেমে নীচু হয়ে পাথরের খাঁজে সেটা খুঁজতে লাগল। মাত্র দু' পয়সা দামের একটি সস্তা চিরুনী। মুসৌরীর কুটিরে থাকাকালে আমি তার জন্যে ওটি কিনেছিলাম। সেই দিন থেকে ওটা তার নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। তার ধারণা ওই চিরুনীর প্রভাবে তার চুল গজাবে আগের চেয়েও ভালো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানটি আমাদের উপর বুলেট বর্ষণ আরম্ভ করল। বুলেটের শব্দ হতে লাগল চারদিকে পাথরে। দু'হাতে মাথা ঢেকে পেমা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার দু' পা অনাবৃত, হঠাৎ একটা বুলেট এসে তার পায়ে লাগল। পেমা পড়ে গেল।

পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বিমান। পেমা গড়িয়ে যাচ্ছিল, লোবস্যাং চেঁচিয়ে বলল, "ধরো, ধরো। নদীতে গিয়ে পড়ে না যায়।"

একটি লম্বা খাম্বা তাকে ধরল। বলল, "সামান্য একটা জিনিসের জন্যে জীবন যাচ্ছিল তোমার।"

লম্বা একটা ঘুমের পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে চারদিকে তাকাল, বলল, "আমি জখম হয়েছি। আমাকে ছেড়ে তোমরা এবার চলে যাও।"

খাংবু-চু নদীর দিকে সে চেয়ে রইল।

আমরা পেমাকে ঘিরে দাঁড়ালাম। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে তার আহত পা। তার মুখে বেদনার চিহ্ন। যে লম্বা খাম্বাটি তাকে বাঁচিয়েছে, হাঁটু গেড়ে পাশে বসে সে প্রার্থনা করছে।

খচ্চরদের শরীরে অস্ত্রোপচার করায় সিদ্ধহস্ত এক খচ্চরপালক জানাল যে, অস্ত্রোপচার করতে হবে। মানুষের অস্থি সম্বন্ধে কোনো ধারণাও তার নেই, কোনো অস্ত্রও তার নেই যে পা থেকে বুলেট বের করবে। তার কথায় বুঝলাম, পায়ের যে জায়গায় বুলেট বিঁধেছে, সেই জায়গা থেকে পা-টা সে কেটে ফেলতে চায়। পেমা এ ব্যাপার বুঝতে পেরে আমার দিকে চেয়ে বলল, "ওই কাণ্ড করে মরতে আমার ইচ্ছে নেই।"

আমি বললাম, "তোমাকে ক্লোরোফরম না করে বুলেট বের করা হবে না।"

"এখানে ক্লোরোফরম কোথায় পাবে?"

"গোরা গিরিপথ এখান থেকে পাঁচ মাইল। তার পরেই ভারতবর্ষ। সেখানে পৌঁছতে পারলেই তোমার চিকিৎসা হবে। কোনো কষ্টই পাবে না।"

লোবস্যাং আদেশ করল, "আর বিশ্রামের দরকার নেই। এবার রওনা হই আমরা।"

জিন ও দড়ি দিয়ে বেশ একটা স্ট্রেচার তৈরি হল। তার উপর শুইয়ে চারজনে পেমাকে বয়ে নিয়ে চলল।

তার যাযাবর জীবনযাপনের অভ্যাস আছে এবং কষ্টসহিষ্ণু সে, এই জন্যে আমি বুঝতে পারলাম সে এ কষ্ট সহ্য করতে পারবে। তাছাড়া হিমালয়ের আবহাওয়া ও উন্মুক্ত বাতাস তাকে সত্বর নিরাময় করতে পারবে।

মাঝে মাঝেই সে চোখ মেলে তাকাচ্ছে ও জিজ্ঞাসা করছে, "আমরা কি গোলাগুলির এলাকা পার হয়েছি?"

লোবস্যাং উৎসাহ দিয়ে বলল, "এখনো না। আমরা শিগগিরই পৌঁছচ্ছি।"

"শরৎকালের আগেই আমি সেরে উঠব।" পেমা পাহাড়ের চূড়ার দিকে চেয়ে বলল, "সকলেই এখানে এসে পৌঁছবে। নতুন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হবে।"

৭। নূতন দিনের অভ্যুদয়

উত্তুঙ্গ হিমালয়ের পবিত্র ভূমির শুদ্ধতা যারা নষ্ট করতে যায় তারা নিত্যনূতন চমকের সম্মুখীন হয়। ওই তুষারধবল উচ্চ পাহাড় ধ্যানী ফকিরের মত আশা করে তার ধ্যান যেন কেউ ভেঙে না দেয়। যে-ই তার কাছাকাছি যায় তাকেই বহু বিঘ্নের মুখোমুখি হতে হয়, এবং ভাগ্য ভালো হলে অভূতপূর্ব পুরস্কারও লাভ করে সে।

উদ্যমশীল অভিযাত্রীর কাছে তুষার রাজ্যের প্রত্যেক পথের বাঁকে বাঁকে নব-জীবনের সংকেত। পার্বত্য হাওয়া অনবরতই তাকে প্রেরণা দেয়—নতুন কিছু করতে হবে, কেউ যা পারেনি তাই করতে হবে। মানুষ কদাচিৎ সফল হয় এই অভিযানে এবং দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদ লাভ করে।

আমাদের প্রত্যাশার আগেই এবার বসন্তের সমাগম হয়েছে। গিরিপথটি এখনো চোখের সীমার মধ্যে আসেনি। কিন্তু অচিরেই এল। ধূসর আকাশের নীচে সুশুভ্র তার চূড়াটি দেখা গেল। দেখা মাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। পেমাও তার আনন্দ চাপতে পারল না, বলল, "উঃ, আশ্চর্য সুন্দর! ওই চূড়ার অধিশ্বরী বিগ্রহের গল্প যদি তোমাকে না বলি তবে ব্যথা পাব, বুলেটের আঘাতের চেয়েও তা তীব্র বেদনা।"

বললাম, "বলো, শুনি।"

সে বলতে লাগল, "জীবনে যখন সর্বপ্রথম ওই গিরিপথ পার হই তখন আমার মা আমাকে বলেছিলেন ওই চূড়ার উপকথা। বহু বহু-দিন আগে সেই বিখ্যাত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঈশ্বরী তারা এক দরিদ্র কিষাণ-কন্যারূপে আবির্ভূত হন। এ ঘটনা ঘটেছিল স্রং-স্তান-গাম্পোর রাজত্বকালে—তিনি চীনা রাজকুমারীকে তাঁর রানী করে নিয়েছিলেন। রানীর স্বভাব বড় অহংকারী, একজন সামান্য তিব্বতী মেয়ে রূপে গুণে তাঁর চেয়ে বড় হবে—তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বালিকা তারাকে তিনি শিকল দিয়ে বাঁধলেন, এবং তাঁর পরিচারিকাকে আদেশ করলেন ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে তাকে নীচে ফেলে দেওয়া হোক। দেখ, ইতিহাসে নির্দয় শাস্তিবিধানের নজির খাড়া করেছে চীনারাই।"

পেমা বলতে লাগল, "কিন্তু ঘটল এক অঘটন। নীচে না পড়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল তারা। হিমালয়ের অধীশ্বর দেবতা, তোমরা ভারতবর্ষে যার নাম দিয়েছ শিব—তিনি, তাঁর হাতের উপরে তারাকে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, সমস্ত বিশ্বকে তিনি যেন দেখাতে লাগলেন ওই অদ্বিতীয়া রূপবতীকে। ঠিক এই জায়গাতেই তারার জন্যে তিনি সৃষ্টি করলেন 'সুখবতী', অর্থাৎ একটা আনন্দনিকেতন। এখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শোক নেই, তাপ নেই, কোনো অশুভ নেই এখানে। তারা যা মনে করেন তাই পান; হোক সে বাদ্যযন্ত্র, হোক সে পোশাক-আশাক, কিংবা গহনা, অথবা হোক সে সুপুরুষ এক স্বামী।"

সে আরো বলল, "নিজের সুখে পরিতৃপ্ত হয়ে তারা সেই সুখৈশ্বর্য বর্ষণ করতে লাগলেন মরলোকে। কিন্তু চীনা রানীটি তাঁকে শাস্তি দিয়েছিল বলে তিব্বতের দিকে তিনি দৃকপাত করতেন না। এই জন্যেই দেশটি এমন বন্ধ্যা এবং দেশের মানুষ এমন দরিদ্র। এই দুর্দশার মূলে তাহলে চীনারাই। যদি ওই চীনাদের এ দেশ থেকে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ করা যায় তাহলেই মাত্র তারার কৃপাদৃষ্টি পড়বে তিব্বতে।

তারা তখন বুঝবেন যে তিব্বতীরা নির্দোষ, এবং তখনই তিনি যাবতীয় সুখৈশ্বর্য বর্ষণ করবেন তিব্বতেও।"

পেমা বলে চলল, "বর্তমানে তারার প্রসন্ন দৃষ্টি ভারতের দিকেই। ওখানেই তিনি সব রকমের সুখ-সম্পদ দান করছেন। ভারতবর্ষ বরাবরই তিব্বতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। এখনকার এই জীবন-মরণ সংগ্রামে সমস্ত তিব্বতী ওই ঈশ্বরী তারার কাছে প্রার্থনা জানায়—যাঁর আবাসস্থান ওই পবিত্র ভারতীয় পর্বতশীর্ষে।"

ওই চূড়াটি পেমার উপর ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ করল। পাহাড়ের পবিত্র বাতাস ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঈশ্বরীর আবাসটি দেখে সে যেন নববলে বলবতী হয়ে উঠল। হিমালয়ের রূপে সে যেন বিভোর হয়ে গিয়েছে।

লোবস্যাং সব সময় তুষারমানবের কথা ও 'ড্রেমস' অর্থাৎ লাল ভালুকের কথা বলতে ভালোবাসে। এই উচ্চতায় থাকে নাকি ওই লাল ভালুক। সে নিজে একজন 'ডগপা' ছিল, অর্থাৎ তিব্বতী যাযাবরদের মধ্যের একজন চোরাকারবারী। তার কাজকারবার ঘোর অন্ধকারেই চলত, এইজন্যে অনেকবার একা একা তাকে এই গিরিপথ পার হতে হয়েছে। এইজন্যে অনেকের ভাগ্যে যা ঘটেনি এমন অনেক বন্যজন্তুর সাক্ষাৎ সে পেয়েছে।

তাদের দেখে ভয় পেত না লোবস্যাং। ডগপা হিসেবে কাজ করাতে সে গর্ব বোধ করে। সে তার অভিজ্ঞতা বলতে লাগল, "হানাদার চীনাদের থেকে তারা কম হিংস্র। একবার শরৎকালে আমি এই গিরিপথ পার হচ্ছিলাম। অকালের তুষারপাতে পথঘাট ঢেকে গিয়েছে। পথ হারিয়েছি কিনা বুঝতে না পেরে একটা কালো জিনিসের দিকে এগোলাম। ভাবলাম ওটা বুঝি 'মণি'—পাথরে খোদা তিব্বতী প্রার্থনা-বাণী। তার এত কাছে গেলাম যে ইচ্ছে করলেই হাত দিয়ে ছুঁতে পারি। কিন্তু চমকে উঠলাম, দেখলাম, একটা জ্যান্ত লাল ভালুক।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমি তারার উদ্দেশে প্রার্থনা আরম্ভ করলাম। ড্রেমোটি আমার দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করল, এবং আমাকে নির্বিবাদে এগিয়ে যেতে দিল। কোনো চীনা টহলদার তিব্বতীদের উপর করুণা দেখিয়ে অমন কাজ করবে না।"

এক চীনা টহলদারের কথা আমার মনে পড়ল, বললাম, "গিরিপথটি নিশ্চয় খুব দূরে না।"

"না। দূর না। সোজা গেলে এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম।"

"তবে ঘুরপথ নিলাম কেন?"

"ডগপাদের নিয়মই এই। প্রথমে 'একা' গুহায় প্রার্থনা জানিয়ে তারপরে গিরিপথ পার হতে হবে।"

"ওই গুহা কোথায়?"

"সামনের ওই তুষারস্তূপের ওপারে।"

"ওই গুহার কথা তো আগে কখনো শুনিনি।"

"হিমালয়ের মধ্যে বড় আশ্চর্য জিনিস।"

"কি আশ্চর্য ব্যাপার সেখানে?"

"প্রথমত, যা-ই দেখবে তাই প্রকৃতির এক নূতন সৃষ্টি। বড় শিলা-স্তূপের উপর থেকে তার প্রবেশপথ। না চিনলে সেখানে যেতেই পারবে না। হাজার হাজার লোক এই পথ দিয়ে যায় বছর-বছর, কিন্তু মাত্র কয়েকজন জানে যে তাদের পায়ের নীচেই এক তীর্থ। ঢোকার সময় নিজেকে কুঁকড়ে নিতে হবে, কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে দেখবে মস্ত হল—হাজারটা হাতি সেখানে অনায়াসে থাকতে পারে। দেয়ালে দেয়ালে কি চমৎকার কারুকাজ—বুদ্ধের আদ্যন্ত জীবন সেখানে আঁকা। মূর্তিগুলিও যেন জীবন্ত, যেন কথা বলে।"

"কি কথা বলে?"

"তা বুঝতে হলে দেব-ভাষা জানতে হবে। আমি তেমন শিক্ষিত নই। তার উপর ওই রঙের জলুসে আমার চোখে ধাঁধা লাগে।"

"কি সেই রং ?"

"অবর্ণনীয়। তা উপভোগ করতে হলে, ভোরের প্রথম আলো যখন প্রবেশ করে ওই গুহায় তখন তা দেখতে হবে। দলাই লামার বিশালাকৃতি দেহরক্ষীর মত তুষারস্তূপের উপর প্রথমে সূর্যের আলো পড়ে। সে আলো প্রতিফলিত হয় গুহার মধ্যের গাঢ় নীল উষ্ণ হ্রদের জলে—মনে হয় এক প্রাসাদ সম্মুখে বুঝি ঝরনা উছলে উঠেছে। সেই ঝলকানো আলো দেয়ালে অঙ্কিত বুদ্ধের জীবনচিত্রের উপর পড়ে। সে আলোকবিভা না দেখলে বিশ্বাস করা দায়।"

"কেউ ওখানে বাস করে না ?"

"কেন, একনাম লামার নাম শোননি ?"

"না।"

"তাহলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত দেবতা তুমি দেখনি। এখন আমরা তাঁর সন্নিকটে। তুমি তাঁকে দেখবে, তাঁর আশ্রম দেখবে। তার পরে তুমি বোলো, তোমাকে এখানে নিয়ে এসে ভালো করেছি কিনা।"

তিনি যদি আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে না আসতেন তাহলে তাঁকে দেখে ভুল করতাম। নিকোলাস রোয়েরিকের আঁকা একটি ঝঞ্ঝার দৃশ্যের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বলে মনে করতাম তাঁকে। একটি মোমের বাতি জ্বলছে, সেই আলোয় তাঁকে দেখে মনে হল যেন পাহাড়ে খোদা এক মূর্তি। ভগ্ন শিলাস্তূপের দাগের মত হয়েছে তাঁর মুখের উপরের রেখাগুলি। কিন্তু চোখের দৃষ্টি খুবই নম্র, খুবই শান্ত। মনে হচ্ছে তাঁর জাগ্রত চোখে যেন স্বপ্ন মাখানো। তাঁর গায়ে উলের একটি লম্বা জামা। পায়ের নিচের অংশ অনাবৃত। হাতে ভিক্ষাপাত্র, তার থেকে একটি একটি করে দানা মুখে দিচ্ছেন। দাড়ি-গোঁফে মুখভরা।

আমাদের হাতে শুকনো যবের দানা দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমরা কি সেই জুটি যাদের মাথার জন্যে চীনারা পুরস্কার ঘোষণা করেছে ?"

লামার উচ্চারণের ভঙ্গিতে পেমা বলল, "হ্যাঁ, মহানুভব।"

"সোজা গিরিপথের দিকে না গিয়ে তোমরা ভালো করেছ। যে গয়লা আমাকে দুধ দেয়, সে বলেছে যে তোমাদের ধরার জন্য চীনারা ওদিকে ভারতীয় এলাকায় ওৎ পেতে আছে।"

"ভারতীয় এলাকায় তারা ঢুকল কি করে ?"

"সে এক লম্বা ইতিহাস। বহুদিনের বন্ধু চীনের সরকারকে অত্যন্ত বিশ্বাসের পরিণাম। হিমালয়ের বুকে সীমান্ত আঁকা নেই। এই অজুহাতে তারা এসে ঢুকেছে এখানে। তাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে ভারত চায় না। যুদ্ধ করতে ভারত চায় না, এই সুযোগ নিয়ে তারা সীমান্ত পার হয়ে ঘাটি নিয়েছে। লাদাক পর্যন্ত গিয়েছে। ভারতীয় টহলদারদের পাকড়াও করেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে। একমাত্র ভরসা তাদের এই যে, শান্তিকামী ভারত ও নিয়ে যুদ্ধ করতে চায় না। শোনা যাচ্ছে, গত সপ্তাহে চীনারা সীমান্ত পার হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে লাচুং উপত্যকা পর্যন্ত গিয়েছে।"

"তার মানে ওই জায়গাটা আমরা হারিয়েছি ?"

"হ্যাঁ। চিরদিনের ভারতের তীর্থস্থান এই একা-গুহাটি পর্যন্ত ভারতের হাত থেকে চলে গিয়েছে।"

"এ ব্যাপারে আমরা কি কিছু করব না ?"

"কি জানি। ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক দলিলপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করেছে যে, ওই অঞ্চল ভারতের। কিন্তু চীনাদের সেই ইতিহাস মান্য করাবার জন্যে কি ব্যবস্থা হবে বলা শক্ত।"

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, "তাহলে পেমার আর আমার বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই বুঝি নেই ?"

উত্তরে তিনি বললেন, "এ বিষয়ে অনুসরণ কর বুদ্ধকে। মনে কর

তাঁর বাণী। তিনি বলেছেন—অপরের উপর নির্ভর কোরো না, নিজের যাত্রার পথ দেখার জন্যে নিজেই প্রজ্বলিত কর নিজের প্রাণের প্রদীপ।"

দেয়ালচিত্রের দিকে চেয়ে মনে হল ভগবান বুদ্ধ সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

গুহার অন্ধকার কোণে এক-পাল লোক বসে ছিল। একনাম লামার উদাত্ত আহ্বানে তারা উচ্চকিত হয়ে উঠল। ওদের একজনের বলিষ্ঠ চেহারা দেখে আমি চমকিত হয়ে উঠলাম, বললাম, "ও কে? জিগমে? তুমি এখানে কি করে?"

সে বলল, "বসন্তকালের পূর্বের ঝরাপাতা আমরা। হাওয়ার তাড়নায় আমরা উড়ে বেড়াই, এবং ভবিষ্যতের জন্যে মৃত্তিকার সার তৈরি করার জন্যে মিশে যাই মাটির সঙ্গে।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা।"

"তুমি জান, আমি আমার কন্যা নিমার জন্যে জীবনধারণ করি। তার উপরে চীনাদের অত্যাচারে আমি এমনই মর্মাহত যে, আমি আমার কর্তব্য কাজই ভুলে গিয়েছি। জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল, এই জন্যে এই মহাপুরুষের কাছে এসেছি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে। এতে আমি শান্তি পাই।"

"এঁকে তুমি ভালো করে চেনো?"

"ভালো করে কিনা বলতে পারব না। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে এঁর কাছে আসছি।"

"সেই সময় থেকে ইনি বুঝি এখানে আছেন?"

"হ্যাঁ। ইনি বলেন তাঁর জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। অনেক গ্রন্থ ইনি পাঠ করেছেন, এবং বহু দেশ ঘুরেছেন। আমার আগে থেকে যাঁরা এঁকে চেনেন তাঁদের একজনের কাছে শুনেছি যে লামা হবার আগে ইনি ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। রাজপ্রাসাদে বাস

করেছেন এবং সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের বহু দেশ দেখেছেন। যে-কোনো ভাষায় তুমি এঁর সঙ্গে কথা বলতে পার, তার উত্তর ইনি দেবেন সেই ভাষায়। রাজনীতি ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র সব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান।"

"সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ?"

"উনি একজন আদর্শ সেনাধ্যক্ষ। যদিও লোকে বলে উনি ভারতের বাইরে এক যুদ্ধে স্টাফ কর্নেল ছিলেন।"

"এতদিন হিমালয়ে থাকা সত্ত্বেও বাইরের জগতের হালের খবর উনি রাখেন কি করে ?"

"ওঁর অনুরাগীরা ওঁকে একটা ট্র্যান্সমিটার-সেট দিয়েছে। চেক-পোস্টের লোকেরা কলকাতা থেকে তাঁর চাহিদা মত খবরের কাগজ ইত্যাদি এনে দেয়। কিন্তু ওই সব উপকরণই তাঁর সম্বল নয়, ওঁর আত্মশক্তিই ওঁকে করেছে এমন মহান। এত মহৎ হওয়া সত্ত্বেও উনি শিশুর মত সকলের সঙ্গেই মেশেন। কোনো সমস্যা-সমাধান করতে হলে উনি সাগ্রহে সহযোগিতা করেন।"

"আজ রাত্রে আমাদের গিরিপথ পার হওয়া ব্যাপারে কিছু করতে পারেন ?"

"নিশ্চয়। এ ব্যাপারে উনিই মাত্র একজন যিনি সাহায্য করতে পারবেন। তোমরা ভাগ্যবান, তাই এখানে এসে পড়েছ।"

সারাদিনের তপস্যার পর তিনি রাত্রের বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করছেন, এই সময়ে আমরা তাঁর কাছে গেলাম আমাদের সমস্যা নিয়ে। চোখ না খুলে শান্ত গলায় তিনি বললেন, "নিজের উপর নির্ভর করো, আর এই গিরিপথ থেকে চীনাদের হটাও। ভীত হয়ে থাকবে না। কারো ধন তোমরা লুণ্ঠন করতে যাচ্ছ না, যে-ধন তোমার তাই উদ্ধার করছ। তোমার দেশকে খণ্ডবিখণ্ড কেন করবে চীনা আক্রমণকারীরা ?"

"তাদের হটানো কি সোজা ?"

"খুব সোজা। বিদেশী কারো উপর নির্ভর করবে না।"

"না। কারো উপর আমরা নির্ভর করছিনে।"

"তাহলে তোমাদের জয় সুনিশ্চিত। ভুয়ো সীমানা চিহ্নিত করে যে পাথরখণ্ড চীনারা বসিয়েছে সেই পাথর সরিয়ে ফেলবে। এবং এই গুহার ওপারে সেটা বসাবে। চিরকাল ধরে যেটা সীমানা, সেইখানে তা বসাবে। তা যদি পার তাহলেই তোমরা তো ভারতভূমিতে আছ বলে ধরা হবে। তখনো যদি চীনারা তোমাদের বাধা দিতে আসে তবে তারা প্রাণের বিনিময়ে তা করবে। এই সামান্য কাজটি করতে পারলেই মাতৃভূমির প্রতি তোমাদের মহৎ কাজ করা হবে, এবং সেইটেই তোমাদের জয় বলে গণ্য হবে। তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেনারাও তখন ওই কাজ করবে। এইভাবে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে হবে।"

"ওই ঢালু থেকে পাথর নিয়ে আসার সময় চীনারা বাধা দেবে না?"

"বেশি সংখ্যায় ওরা এদিকে থাকলে বাধা দিত। জেনে রাখ, সংখ্যায় ওরা আছে মাত্র পাঁচজন। ভারতের দিক থেকে কোনো বাধা তারা আশা করছে না। তারা উল্টো দিক থেকে কেবল রসদ প্রত্যাশা করছে। খুব কৌশলে গিয়ে তোমরা তাদের ঘাড় ধরে ঠেলে ফেলে দেবে ওই খাদে। এ কাজের জন্যে এইটেই সুবর্ণসুযোগ। সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে।"

সাতজন লোক সঙ্গে নিয়ে জিগমে তৈরি হয়ে নিল। লোবস্যাং পথ চিনত। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি বুদ্ধ আশীর্বাদ করছেন।

ঘন মেঘের আড়ালে পাহাড় যেন ঘুমচ্ছে অকাতরে। কোনো-রকম শব্দ না করে আমরা এক লাইনে মার্চ করে চললাম, আমাদের তিব্বতী বুটের আওয়াজ কেবল বাজতে লাগল বরফের উপর।

চীনা কুটীরগুলিও শান্ত। একটা ফাটলে কান পেতে জিগমে বলল, "পাঁচজনই নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে।"

পাথরের উপর একটা লাথি দিল লোবস্যাং। টর্চ জ্বালা মাত্র চীনা পাঁচজন আমাদের পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা চাইল। তাদের স্বয়ংচালিত বন্দুক আমরা দখল করলাম।

এলোপাথাড়ি লাথি দিতে দিতে জিগমে বলল, "এই ইঁদুরদের দেখে আমরা ভয় পেয়েছিলাম। এই লাথিটা নিমার উপর অত্যাচারের জন্যে, এই লাথিটা আমার নাতিকে হত্যা করার জন্যে।"

তাদের তল্লাসী করার জন্যে চটপট ব্যবস্থা করা হল। তারা বিশ্বাসঘাতক, শয়তান। আমাদের না ধরার অছিলা করে হয়তো হঠাৎ গুলি ছুঁড়তেও পারে। জিগমে তাদের দু' হাত তুলে দাঁড়াতে আদেশ করা মাত্র তারা তা পালন করল।

তাদের দেহ এবং তাদের কুটির তল্লাসী করা হল। একটা ম্যাপ-ভর্তি কেস পাওয়া গেল, এবং লাচুং অবধি যুদ্ধের চিত্রাবলী। তাতে ইয়াটুং থেকে খাংবু-চু পর্যন্ত সড়ক দেখানো হয়েছে অধিকৃত রূপে, এবং লাচুং ও লাচান পর্যন্ত এলাকা অধিকার করতে হবে বলে নির্দেশিত। এতে বোঝা গেল, নাতুলা ও জেলেপলা অঞ্চলটি ঘেরাও করার মতলব ওদের। আর-একটাতে তোয়াং-এর দিক থেকে তাদের অগ্রসর হওয়ার পথ আঁকা। তাদের দুইটি সেনাবাহিনীর তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র বরাবর এসে মিলিত হওয়ার মতলব—এর থেকে তা বোঝা গেল। এবং এই দুই নদীর উত্তরাংশের ভূভাগ করতলগত করার ইচ্ছা তাদের। এই ম্যাপে তাদের পরিকল্পনার স্পষ্ট চেহারা পাওয়া গেল।

রাগত হাসি হেসে বলল জিগমে, "সীমান্ত-প্রহরী দিয়ে এদের বাধা দেওয়ার ইচ্ছা দিল্লীর। তা কি সম্ভব?"

তখন সে একটা নোট লিখে ভারতীয় চেক-পোস্টে পাঠালো। আর ম্যাপগুলো পাঠালো থ্রু প্রপার চ্যানেল নয়, সোজাসুজি হাইকম্যাণ্ডের বরাবরে। আর একটা অনুরোধ সে পাঠালে, যেন পাথর সরিয়ে

আমরা যেখানে ন্যায্য সীমানা চিহ্নিত করছি, সেখানে যেন সেনা পাঠানো হয়।

সে হাসল, "কঠিন পরিশ্রম আমরা করেছি।" এই বলে ওই পাঁচজন চীনাকে আদেশ করে তাদের দিয়ে সীমানার প্রস্তরখণ্ডটি বইয়ে এনে আমাদের অভিপ্রেত জায়গায় তা বসিয়ে নিল। আমার দিকে চেয়ে বলল, "দেখ, কেমন অনুগত ওরা।"

কাজ চুকিয়ে জিগমে চীনাদের বলল, "তোমাদের এখন কি করতে পারি?"

দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে একজন চীনা বলল, "ভারতীয় এলাকার কোথাও আমাদের লুকিয়ে থাকতে দাও।"

"আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছ?"

"আমরা যদি ফিরে যাই তাহলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে, আমাদের পরিবারের সকলকে হত্যা করবে। কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে পারলে বাঁচার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।"

"সাপকে দুধকলা দিয়ে পুষতে পারব না।"

"তাহলে আমাদের দিল্লীতে পাঠাও। চীনাদের আক্রমণের সব প্ল্যান আমরা বলে দেব।"

"তোমরা পিকিং-এর শাসকদের ক্রীতদাস। তোমাদের আমরা বিশ্বাস করিনে। তোমাদের বলার অপেক্ষায় আমরা নেই। তাদের সব প্ল্যান আমাদের হাতে আছে। সভ্য দেশের নিয়ম অনুসারে তোমাদের গুলি করে মারা উচিত। আমাদের দেশ আক্রমণের প্ল্যান-সমেত তোমাদের হাতে-নাতে ধরেছি। মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র শাস্তি।"

"মাপ করুন। ক্ষমা করুন। মার্জনা করুন আমাদের।"

"তোমাদের মারা উচিত নয় বলে না, দিল্লীকে বিব্রত করতে চাইনে, এবং চীনারা তোমাদের যাতে শহীদ বলে চ্যাচাতে আরম্ভ না করে— এই জন্যে তোমাদের ছেড়ে দিলাম।"

"কিন্তু আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই।"

"তবে নরকে যাও।" ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে জিগমে বলল, "আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।"

পরামর্শ করার জন্যে আমরা একটু তফাতে গেলাম। জিগমে তাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করে এল। তার পরে চেঁচিয়ে বলল, "আমাদের সীমান্তকে সেলাম কর, মহান দেশ ভারতবর্ষকে নমস্কার কর।"

চীনারা বলতে লাগল, "চামফুল, চামফুল।" অর্থাৎ নমস্কার, নমস্কার।

"এবার শোনো। তোমরা যাদের ক্রীতদাস তাদের জন্যে কিছু বাণী নিয়ে যাও। তাদের গিয়ে বল, বিরাট সেনাবাহিনী এই গিরিপথে উপস্থিত। যে-কেউ আসবে তার হাড় চূর্ণ হবে। ঘোরো। অ্যাবাউট টার্ন। মার্চ। কুইক মার্চ। মারগ্যুগ, মারগ্যুগ—ভাগো, নিকাল হও।"

একা-গুহার দিকে যাতে ওরা না যায় সেইজন্যে জিগমের একজন সৈনিক রাইফেল নিয়ে তাদের পিছন পিছন গেল। অবশ্য একা-গুহার বিষয় ওরা কিছুই জানে না।

জিগমে চেঁচিয়ে, ওদের শুনিয়ে বলল, "ওদের বলে দাও, ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোক এক হয়ে হিমালয় রক্ষার জন্যে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কাছ থেকে হিমালয় ছিনিয়ে নিতে কেউ পারবে না। আমাদের মাতৃভূমির চিরকালের শিরোভূষণ ওই হিমালয়।"

সকালের দিকে চেক-পোস্ট থেকে জিগমের সহকর্মীরা বিপুল সংখ্যায় এসে হাজির হল গিরিপথের চূড়ায়। তারা একটা ডাণ্ডির ব্যবস্থা করল —আট বেহারার সেই পালকি এল পেমার জন্যে। সংকেত পাঠানো হল, যেন পথের ধারে জীপ প্রস্তুত রাখা হয়। এই ব্যবস্থার জন্যে ধন্যবাদ। একদিনের মধ্যেই আমরা কালিম্পঙে পৌঁছতে পারব।

পেমা তার এই সৌভাগ্য বিশ্বাস করতেই পারছিল না।

একনাম লামার দেওয়া বনৌষধিতে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে,

মুখে প্রফুল্লতা ফিরে এসেছে। প্রার্থনা করতে করতে সে বলতে লাগল, "অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য। কাল এই সময়ে আমরা কালিম্পঙে। কি সুন্দর শুনতে—কালিম্পঙ। আনন্দভূমির রাজধানী। চিক-নায়ি-সাম —এক দুই তিন—শুনতে শুনতেই পৌঁছে যাব সেখানে।

দিগন্তের নিচে জন্ম নিচ্ছে সুপ্রভাত। পুব আকাশে গাঢ় রক্তবর্ণের একটা গোলক দেখা গেল। দেবতারা ও বিগ্রহরা যেন তাঁদের মাথা তুললেন—জেগে উঠলেন।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে উচ্চভূমিতে আমাদের সীমান্ত-প্রহরীরা পতাকা উত্তোলন করেছে। একনাম লামা এই পতাকা উন্মোচন করেছেন। হাওয়া লেগেছে পতাকায়।

সকলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রহরীরা জাতীয় সংগীত বাজাতে লাগল। পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে উঠল তার প্রতিধ্বনি—জয় হে জয় হে, জয় জয় জয়—

তিব্বতীরা জেলদা নিয়ে সমবেত, বন্ধুত্ব ও প্রীতির নিদর্শন এই ওড়না। কয়েকটি শৃঙ্গের ওপারে তিব্বত। নূতন দিনের প্রতীক্ষায় আছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা গৌরীশৃঙ্গ মাকালু এভারেস্ট ও অন্যান্য শৃঙ্গ নির্ভীক প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। নানা রঙের মেঘ তাদের ঘিরে ধরছে। তারা কখনো নির্মাণ করে তুলছে যেন জীবন্ত শিব ও বুদ্ধ এবং তাঁদের প্রণয়িনী পার্বতী ও যশোধারা।

ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ক্রমেই ঊর্ধ্বে উন্নীত হচ্ছে—মৃত্তিকার দেশ ছেড়ে অনেক ঊর্ধ্বে পাহাড় ছাড়িয়ে আকাশ ভেদ করে। —নূতন দিনের অভ্যুদয়ের ইঙ্গিত নিয়ে।